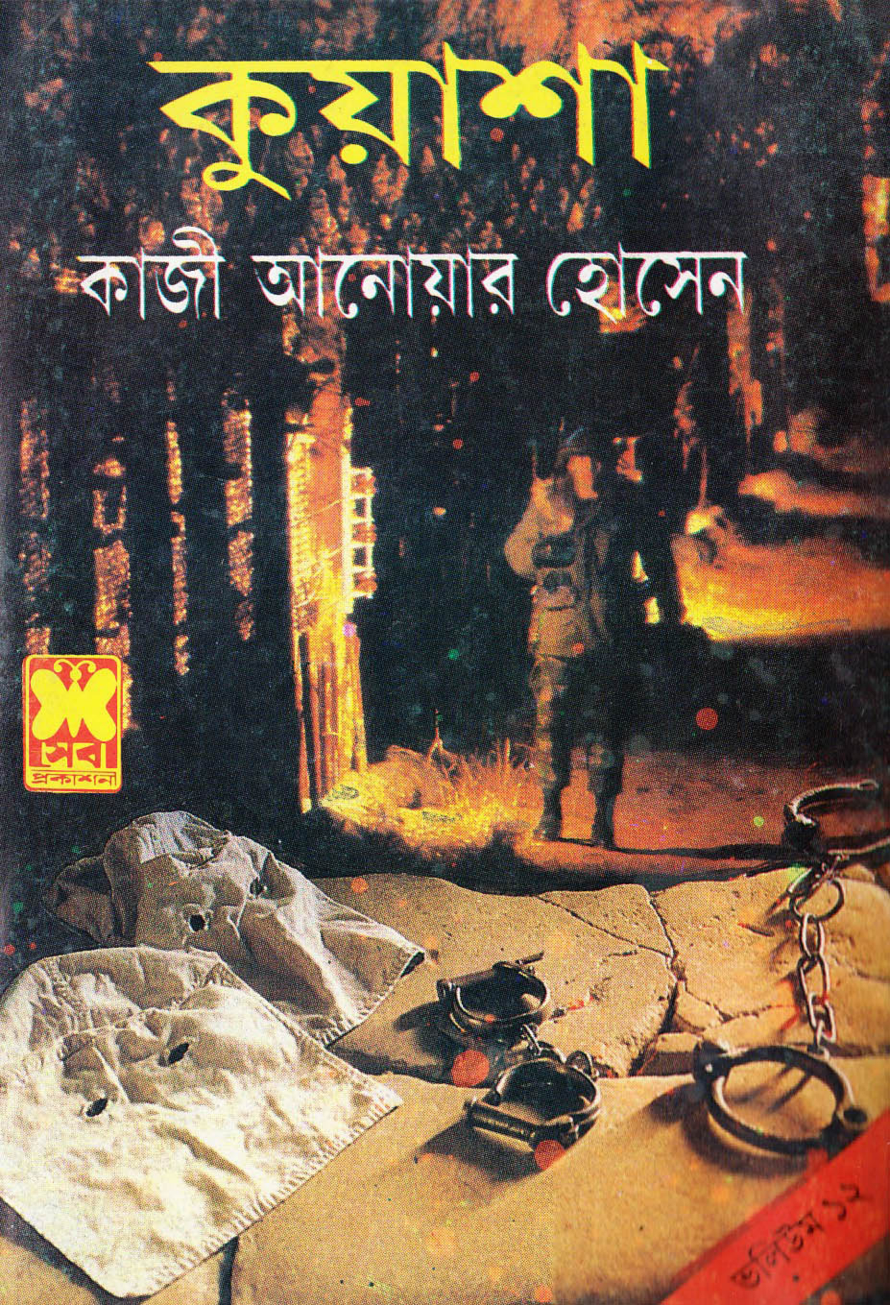

কুয়াশা
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনী
ভলিউম ১১

ভলিউম ১২

কুয়াশা

৩৪, ৩৫, ৩৬

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

সূচী

কুয়াশা ৩৪	৫
কুয়াশা ৩৫	৪৫
কুয়াশা ৩৬	৮৯

কুয়াশাঃ ৩৪

প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর, ১৯৭২

এক

শহীদের বাড়ির বৈঠকখানা।

পাশাপাশি সোফায় বসে আছে কুয়াশা এবং কামাল। মুখোমুখি আর একটি সোফায় মহুয়া। শহীদকে কোথায়ও দেখা যাচ্ছে না। কুয়াশার কোলে সরোদ।

পড়ন্ত বিকেল। চারদিক কেমন যেন নিশ্চুপ। সরোদের হালকা সুরলহরী দিকে দিকে অপূর্ব এক আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে।

কারও মুখে কোন কথা নেই। কারও চোখে পলক পড়ছে না। কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে কেটে যাচ্ছে সময়। সরোদের মিষ্টি সুরের সাথে কোন্ অতলতলে হারিয়ে যাচ্ছে ওদের হৃদয়। তন্ময় হয়ে বাজাচ্ছে কুয়াশা। মিয়াঁ কি টোড়ির সুর বিচিত্র এক ঝঙ্কার তুলছে বৈঠকখানার ভিতর।

এই মুহূর্তে কুয়াশার অন্য কোন পরিচয় নেই। সে সুরের সাধক। সে প্রতিভাবান সঙ্গীত শিল্পী। নিজেকে বিলিয়ে দেবার এই সূক্ষ্ম শিল্প মাধ্যমকে কুয়াশা গ্রহণ করেছে অন্তর দিয়ে। অনেক ত্যাগ, অনেক পরিশ্রমের বিনিময়ে কুয়াশা আয়ত্ত করেছে এই অপূর্ব সুর সৃষ্টির ক্ষমতা। যন্ত্র নিয়ে যখন সে মেতে ওঠে তখন পৃথিবীর অস্তিত্বের কথা মনে থাকে না তার। ভুলে যায় তার বিজ্ঞান চর্চার কথা, দেশের কথা, দশের কথা।

শিল্পীর ধর্মই তাই। কুয়াশা একনিষ্ঠ সাধক। সার্থক শিল্পী।

যন্ত্রের সূক্ষ্ম তারে শেষ আঁচড় টেনে সিলিঙের দিকে তাকাল কুয়াশা। মিষ্টি মধুর সুর হারিয়ে যেতে শুরু করেছে অবলীলায়।

নেমে এল কুয়াশার দৃষ্টি।

কামালের দিকে তাকাল কুয়াশা। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে কামাল এখনও কুয়াশার সরোদের দিকে।

মহুয়ার দুই চোখে গর্ব। দাদার সুর সৃষ্টির অদ্ভুত ক্ষমতার সাথে তার পরিচয় আছে। কুয়াশার সরোদ বাদন যতবার শোনে মহুয়া ততবারই গর্বে ফুলে ওঠে তার বুক।

থেমে গেছে সুর। কিন্তু নিস্তব্ধ বৈঠকখানায় সেই হারিয়ে যাওয়া সুরের রেশ এখনও যেন ভেসে বেড়াচ্ছে।

মৃদু হেসে তাকাল কুয়াশা মহুয়ার দিকে। বলল, 'চা খাওয়াবিনে মহুয়া?'

মহুয়া যেন সংবিৎ ফিরে পেল কুয়াশার কথায়।

'এই যে দাদা, আনছি।'

উঠে দাঁড়াল মহুয়া।

কুয়াশা তাকাল কামালের দিকে।

নড়েচড়ে উঠল কামাল। বলল, 'অপূর্ব! অপূর্ব তোমার হাত কুয়াশা। তুমি ধন্য।'

হেসে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চাইল কুয়াশা, 'শহীদ কি ফিরবে সন্ধের আগে?'

দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল মহুয়া। বলল, 'কখন ফিরবে তার কি ঠিক আছে, দাদা। হয়ত রাত দুপুরে ফিরবে। তুমি কিন্তু আজ খেয়েদেয়ে যাবে, কোন কথা শুনব না আমি।'

হেসে ফেলল কুয়াশা। বলল, 'নারে, আমাকে ফিরতে হবে। আর একদিন খাব।'

'ওসব শুনব না আমি।'

মহুয়া বলল, 'চা নিয়ে আসি আমি। তোমরা বসো।' চলে গেল মহুয়া দ্রুত পায়ে।

কামাল বলল, 'শহীদ গেছে ওর বন্ধু আসাদ চৌধুরীর কাছে। ভদ্রলোক চাইছেন শহীদের সাথে মিলে একটা সিনেমা প্রযোজনা করতে।'

কুয়াশা বলল, 'দেশের যা অবস্থা তাতে নতুন কোন ইনভেস্টমেন্টে না যাওয়াই উচিত।'

কামাল প্রশ্ন করল, 'দেশের বর্তমান অবস্থা দেখে তোমার কি মনে হচ্ছে?'

একটু যেন তিক্ত হাসল কুয়াশা। বলল, 'মনে হবার মত কথা একটাই। পশ্চিমারা মরণ কামড় দেবে।'

'তার মানে?'

কামাল প্রশ্ন করে, 'আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যেতে পারছে না বলতে চাও?'

'আওয়ামী লীগ কেন, বাংলাদেশের কোন পার্টিই কোনদিন ক্ষমতায় যেতে পারবে না এই ব্যবস্থায়।'

কুয়াশা বলে চলল, 'আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি বাঙালীদের সাথে মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতা করার পাঁয়তাড়া করছে ইয়াহিয়া খান। জাতীয় পরিষদের বৈঠক পিছিয়ে দেবার একটিই কারণ। ওরা সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করছে।'

অবাক হয়ে জানতে চাইল কামাল, 'তুমি কি বলতে চাও ইয়াহিয়া সেনাবাহিনী দিয়ে বাঙালীদেরকে দমাবার চেষ্টা করবে? দেশের লোক এখন অত বোকা নয়, ভীতুও নয়। সেনাবাহিনী যে কিছুই করতে পারবে না তা তো পরিষ্কার। কারফিউ দিচ্ছে না ওরা প্রত্যেক দিন? কাজ হচ্ছে কি? কারফিউও তো মানছে না পাবলিক। সেক্ষেত্রে সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করে কি ফল লাভ করতে চায় ইয়াহিয়া?'

'সেনাবাহিনীকে ছোট করে দেখো না কামাল।'

কুয়াশা বলল, 'পাঞ্জাবী সেনারা পৃথিবীর সবচেয়ে কোরাপটেড সেনা। ওদের দ্বারা সবকিছুই সম্ভব। রাতারাতি ওরা রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করে দিয়ে, নেতাদেরকে কয়েদ করে, সারা বাংলাদেশে ব্যাপক গণহত্যা চালিয়ে একটা দক্ষযক্ষ কাণ্ড বাধিয়ে দিতে পারে। সে ক্ষমতা ওদের আছে। এবং সে ক্ষমতাই ব্যবহার করতে যাচ্ছে ওরা। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীকে ছোট করে দেখতে নেই।'

কামাল বলল, 'বলো কি তুমি, কুয়াশা! কিন্তু এতে লাভ হবে কি? বাঙালীদেরকে কি আর দাবিয়ে রাখা সম্ভব?'

হাসল কুয়াশা। বলল, 'দাবিয়ে রাখা অসম্ভব। ওরা যা করতে যাচ্ছে তা ওদের জন্যে স্রেফ আত্মঘাতী। কিন্তু এ ছাড়া ওদের আর কোন পথও নেই।'

'পথ নেই! তার মানে!'

কুয়াশা বলল, 'জলের মত পরিষ্কার। বাঙালীরা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। সে দাবি মেটাতে হলে শোষণের কুমতলব ত্যাগ করতে হবে পাঞ্জাবীদেরকে। পাঞ্জাবীরা ইসলাম এবং বৃহত্তম ইসলামিক রাষ্ট্রের দোহাই দিয়ে বাংলাদেশকে জোর করে কলোনী করে রেখেছে শুধু দুটো উদ্দেশ্যে--শোষণ এবং শাসনের। বাঙালীদের দাবি মেনে নিলে উদ্দেশ্য ওদের ব্যর্থ হয়ে যায়। সুতরাং ওদের পথ একটাই। বাঙালীরা তো এমনিতেই ওদের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে কেন্দ্রে সরকার গঠন করার সুযোগ পেলে। সেটা তারা হতে দেবে কেন? পাকিস্তানের পুঁজিপতিরা তা চাইতে পারে না। ইয়াহিয়া তাদের পরামর্শেই শেষ চাল চালতে যাচ্ছে। ব্যাপক গণহত্যা চালিয়ে চেষ্টা করবে ওরা বাঙালীদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে। সেজন্যেই বলছি দেশের সামনে অকল্পনীয় বিপদ রয়েছে।'

কামাল প্রশ্ন করল, 'ফলাফল কি হবে বলে তুমি মনে করো, কুয়াশা?'

কুয়াশা বলল, 'আমি পাঞ্জাবী সেনাদেরকে বিশ্বাস করতে পারি না। ওরা ভয়ঙ্কর একটা কাণ্ড বাধাবেই। এমন কোন হীন কাজ নেই যা ওদের দ্বারা সম্ভব নয়। ব্যাপক গণহত্যা চালাবে ওরা। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ওরা ওদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারবে। বাঙালী আজ জেগেছে। আমরা আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবই। মুক্তির জন্যে দরকার রক্ত দান। বাঙালীরা প্রস্তুত হয়েই আছে, কামাল। বাধা পেলেই রুখে দাঁড়াবে তারা। সাত তারিখের ভাষণে শেখ সাহেবও সে কথা বলেছেন। তাই না? এবারের সংগ্রাম যেঁ আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম তাতে কোন ভুল নেই। তবে সংগ্রাম এক্ষেত্রে সশস্ত্র সংগ্রাম হতে বাধ্য। সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া কোন জাতির মুক্তি ঘটে না।'

কামাল বলল, 'চিন্তার কথা। আমি এতদিন ভাবছিলাম আলোচনার মাধ্যমে,

একটা মীমাংসায় পৌছুনো যাবে। কিন্তু তোমার কথা শুনে বড় একটা ভরসা পাচ্ছি না।'

মৃদু হেসে দরজার দিকে তাকাল কুয়াশা।

মহুয়া প্রবেশ করছে বৈঠকখানায়। পিছনে ট্রে হাতে দশাসই গফুর।

টেবিলে নাস্তার প্লেট এবং চায়ের কাপ সাজিয়ে দিয়ে স্বল্পবাক গফুর চলে যাচ্ছিল।

পিছু ডেকে কুয়াশা বলল, 'গফুর, ডি. কস্টাকে একটু ডেকে দাও তো।'

কর্কশ গলায় গফুর জানাল, 'কস্টা সাহেব বাইরে গেছেন। ফিরলে ডেকে দেব।'

অন্দরমহলে চলে গেল গফুর।

চা পান শেষ হতেই বারান্দায় ত্রস্ত পদশব্দ শোনা গেল। দরজার দিকে মুখ তুলে তাকাল কুয়াশা।

মহুয়াকে কি যেন বলতে গিয়েও থমকে গেল কামাল।

মেয়েলি পায়ের হালকা অথচ দ্রুত শব্দ এগিয়ে আসছে বারান্দা ধরে।

'লীনার কলেজ-চলছে এখনও।'

হাতঘড়ি দেখে বলে উঠল মহুয়া, 'কে আসছে তাহলে?'

মহুয়ার কথা শেষ হতেই বৈঠকখানার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল বিশ-বাইশ বছরের এক শ্যামলা যুবতী। দরজার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে সে।

ওরা তিনজন প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল যুবতীর দিকে।

একে একে পাঁচ-সাত সেকেন্ড কেটে গেল। কারও মুখে কোন কথা নেই।

যুবতী উত্তেজিত। বেশ জোরে জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ছে সে।

'মি. শহীদ!'

যুবতী কামরায় পা দিয়ে কুয়াশার দিকে এগিয়ে এল সরাসরি, 'আপনাকেই আমার দরকার। আপনি কি দয়া করে আমার সমস্যার কথাগুলো···।'

যুবতীর কথা শেষ হল না।

কুয়াশা অপ্রতিভ বোধ করছে সামান্য। সে বলতে চাইল, 'দেখুন, আমি···।'

কুয়াশার সামনে এসে দাঁড়াল যুবতী। কুয়াশাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠল, 'দেখুন, আপনার ফী কত তা আমি জানি না। কিন্তু সে জন্যে চিন্তা করবেন না। আপনার প্রাপ্য আপনি পাবেন। কিন্তু সবচেয়ে আগে আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনুন আপনি।'

কামাল কথা বলে উঠল যুবতী দম নেবার জন্যে থামতেই।

'শান্ত হোন মিস···'

যুবতী নিজের নাম এবং পরিচয় দিল, 'আমি মি. ইমাম তালুকদারের মেয়ে। রুমা তালুকদার। সাভারের তালুকদার কটেজের নাম শুনেছেন নিশ্চয়? ওটা

আমাদের।'

কামাল বলে উঠল, 'আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খানের সহকারী কামাল। আপনি আগে শান্ত হয়ে বসুন। তারপর ধীরেসুস্থে বলুন…।'

কুয়াশা একটা চুরুট ধরিয়ে তাকাল যুবতীর দিকে। মহুয়ার পাশে বসে পড়ল যুবতী ধপ্ করে। তারপর সরাসরি কুয়াশার দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করল, 'প্রথমেই এভাবে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমি, মি. শহীদ।'

কুয়াশা আবার চেষ্টা করল যুবতীর ভুল ভেঙে দেবার, 'দেখুন, আপনি ভুল…।'

'আমি জানি আপনারা কিছু মনে করেননি। কেন না তেমন একটা বিপদে না পড়লে কেউ এভাবে কারও বাড়িতে ঢোকে না। যাকগে আমি অদ্ভুত একটা সমস্যা নিয়ে এসেছি মি. শহীদ। আজ মাত্র তিনঘণ্টা আগে চিঠিটা পেয়েছি আমি। সেই থেকে মুহূর্তের জন্যেও স্থির হতে পারছি না।'

কামাল বলল, 'আপনি বরং গোটা ব্যাপারটা গুছিয়ে নিয়ে প্রথম থেকে বলার চেষ্টা করুন।'

যুবতী কিন্তু কামালের দিকে তাকাল না।

মহুয়া উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি একটু ঘুরে আসি রান্না ঘর থেকে।'

মহুয়া চলে যেতে যুবতী কুয়াশার দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করল, 'গোড়া থেকেই বলি আমি। আমাদের সাভারের বাড়িতে আমার বাবা গত তিন বছর ধরে একাই থাকেন। আমি বছর তিনেক ধরে ভার্সিটির হোস্টেলে থাকি। মাঝেমধ্যে ছুটিতে যাই বাবার কাছে। পড়াশোনার চাপে পড়ে গত মাস দুয়েক যাওয়া হয়নি। তবে প্রতি মাসেই বাবা টাকা পাঠিয়ে দেন মানি অর্ডার করে। গত মাসেও পাঠিয়েছেন। মানি অর্ডার ফর্মের সাথে দু'এক ছত্র লেখেনও তিনি।'

দম নেবার জন্যে থামল মিস তালুকদার। তারপর বলতে শুরু করল, 'গাতমাসেও লিখেছিলেন বাবা। কিন্তু তাঁর লেখার কোথাও একথা জানাননি যে তিনি বিদেশে যাচ্ছেন বাবা আমাকে না জানিয়ে হঠাৎ দেশ ত্যাগ করে ইউরোপে চলে যাবেন তা হতেই পারে না।'

যুবতী ঝুঁকে পড়ল কুয়াশার দিকে। বলতে লাগল, 'কিন্তু তাই হয়েছে। আজ বাবার চিঠি পেয়েছি। লন্ডন থেকে এসেছে চিঠিটা। লিখেছেন বিশেষ এক কারণে আমাকে না জানিয়েই লন্ডনে যেতে হয়েছে তাঁকে। ফিরে আসছেন আগামী বারো তারিখে। তার মানে আগামী পরশু দিন।'

কামাল বলল, 'আপনার সমস্যাটা কিন্তু ঠিক পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না।'

যুবতী কুয়াশার দিকে তাকিয়েই বলল, 'বাবা আমাকে কোনদিন টাইপ করা চিঠি পাঠান না। নিজের হাতে লেখা চিঠিই তিনি পাঠান আমাকে। কিন্তু লন্ডন থেকে যে চিঠি আমি পেয়েছি সেটি টাইপ করা। সই অবশ্যি বাবারই। কিন্তু সইটা নকল

হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। চিঠিতে তিনি লিখেছেন যে লন্ডন যাবার আগে বাড়ির চাকর এবং বাবুর্চীকে বিদায় করে দিয়েছেন তিনি। আমি যেন বাবুর্চী এবং একজন চাকরের ব্যবস্থা করে পাঠিয়ে দিই বাড়িতে। যাতে বাড়ি ফিরে তাঁর খাওয়াদাওয়ার কোন অসুবিধে না হয়। এটাও অবিশ্বাস্য, মানে মেনে নিতে পারছি না আমি ঘটনাটা। যে বাবুর্চী এবং চাকরটি ছিল আমাদের বাড়িতে তারা বহুদিনের পুরানো লোক। প্রায় দশ বছর ধরে তারা আছে আমাদের বাড়িতে। বাবা তাদেরকে বিদায় করে দিতে পারেন না। না, অসম্ভব। বাবা এত নিষ্ঠুর, এমন অবিবেচক আমি বিশ্বাস করতে রাজী নই।'

কুয়াশা প্রশ্ন করল, 'আপনার ধারণাটা তাহলে ঠিক কিরকম?'

'আমার ধারণা কিছুই নয়। আমি আপনার সাহায্য চাই, মি. শহীদ। বড় গোলমেলে ঠেকছে গোটা ব্যাপারটা। কোথায় যেন একটা গভীর রহস্য রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না কেন? এক, টাইপ করা চিঠি। দুই, আমাকে না জানিয়ে বাবা লন্ডনে গেছেন। তিন, পুরানো চাকরবাকরকে বিদায় করে দিয়ে গেছেন। এতগুলো অসম্ভব ঘটনা ঘটতে পারে না। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন রহস্য আছে।'

কুয়াশা বলল, 'আপনার কথা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আপনি তো আগামী তিন দিন অপেক্ষা করে দেখলেই পারেন। আপনার বাবা ফিরলে তার সাথে দেখা করুন আপনি।'

মিস তালুকদার বলে উঠল, 'সে কথাই ভেবেছিলাম আমি। কিন্তু কেন যেন ভীষণ ভয় করছে আমার। যে ঘটনাগুলো ঘটে গেছে সেগুলো আমার কাছে এত বেশি বিস্ময়কর যে ভয় পাওয়া ছাড়া উপায় কি? এদিকে বাবার চিঠি পাবার পরই বাড়িতে ফোন করি আমি। সেক্রেটারির ফোন ধরার কথা। কিন্তু কেউ ধরেনি ফোন। সম্ভবত সেক্রেটারিও নেই বাড়িতে। এর কারণ কি? মি. শহীদ, ব্যাপারটাকে আপনি দয়া করে হালকা ভাবে দেখবেন না। আমি একটুতেই বিচলিত হবার মেয়ে নই। আমার মন বলছে কোন একটা বিপর্যয় কোথাও না কোথাও ঘটে গেছে। আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না, মি. শহীদ। প্লীজ!'

কামাল সাগ্রহে তাকিয়ে আছে কুয়াশার দিকে।

কুয়াশা প্রশ্ন করল, 'আমার একটি প্রশ্ন। আপনি সরাসরি পুলিসের কাছে না গিয়ে এখানে এলেন কেন?'

মিস তালুকদার বলল, 'পুলিসের কাছে কেন যাইনি? দেখুন, ব্যাপারটা পারিবারিক। হয়ত দেখা যাবে উপযুক্ত কারণেই বাবা লন্ডনে গেছেন চাকর বাকরদেরকে চিরতরে বিদায় করে দিয়ে। সেক্ষেত্রে পুলিস তাকে বিরক্ত করুক তা আমি চাই না। বাবা বিরক্ত হবেন আমার ওপর।'

কুয়াশা তাকাল কামালের দিকে।

কামাল মাথা নাড়ল মৃদু।

কুয়াশার ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে উঠল।

বলল, 'বেশ, মিস তালুকদার। আমরা তদন্ত করব।'

'ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ।' যুবতী স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে উঠল সাথে সাথে।

প্রয়োজনীয় কিছু কথাবার্তার পর মিস তালুকদার বিদায় নিয়ে চলে গেল।

যুবতী বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর কামাল বলল, 'যাচ্ছি আমরা, কেমন, কুয়াশা? চলো, দেখে আসা যাক। শহীদকে তাক লাগিয়ে দেয়া যাবে। ওর নাম ধারণ করো তুমি। আর আমি, আমি তো অরিজিন্যাল।'

'উঁহুঁ।'

কুয়াশা বলল, 'তুমিও অরিজিন্যাল নও, আমিও নই। আমি যাচ্ছি ছদ্মবেশে। তুমিও।'

'ওয়েট, ওয়েট! হামাকে ছাড়িয়া কোঠায় যাওয়া হইটেছে, জানিটে পারি কি?' দোরগোড়ায় উদয় হয়েছে ডি. কস্টা।

পরনে তার ঢোলা প্যান্ট। মাথায় হ্যাট। রোগা শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন। কুয়াশার সামনে এসে দাঁড়াল সে।

কুয়াশা বলল, 'এই যে ডি. কস্টা সাহেব, কোথায় ছিলেন আপনি?'

'ইনভেস্টিগেশনে বাহির হইয়াছিলাম।'

ডি. কস্টা গম্ভীর ভাবটা ফিরিয়ে আনল চোখেমুখে। বলল, 'ঠাক সে কঠা। কোঠায় যাইটেছেন হাপনারা?'

কামাল বলল, 'একটা কেস পাওয়া গেছে। সেটার ব্যাপারেই যাচ্ছি আমরা।'

'হাপনারা কেন আবার যাইবেন?'

একটু যেন বিরক্ত হয়ে উঠল ডি. কস্টা। বলল, 'হামি ঠাকটে হাপনারা আবার কেন নাক গলাবেন? এসব ব্যাপারে হামিই টো যঠেষ্টো! টা কেসটা কিরকম, টেল মি।'

কুয়াশা বলল, 'আপনিও যাবেন আমাদের সাথে, ডি. কস্টা সাহেব। শুনুন, আপনার কাছে যে প্যাকেটটা দিয়েছিলাম, সেটা দিন তো।'

'প্যাকেট!' ডি. কস্টা হোঁচট খেল যেন।

কুয়াশা কথা না বলে তাকিয়ে রইল ডি. কস্টার দিকে। ডি. কস্টা পিট পিট করে তাকিয়ে রয়েছে। হঠাৎ সে বলে উঠল, 'প্যাকেটটা ফেলে এসেছি এক রেস্টুরেন্টে। ঠিক হ্যায়, এনে ডিচ্ছি এখুনি।'

কথাগুলো বলে ডি. কস্টা বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

মহুয়া এসে ঢুকল কামরায়।

কামাল তাকিয়ে ছিল অপর দরজাটার দিকে। ও দেখল ডি. কস্টা কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেও দরজার কাছ থেকে সরে যায়নি।

কামাল ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল সেদিকে। কয়েক সেকেন্ড পরই দেখা গেল ডি. কস্টা উঁকি দিচ্ছে।

কামালের সাথে চোখাচোখি হতেই ডি. কস্টা হাত ইশারায় ডাকল কামালকে।

কাউকে কিছু না বলে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কামাল।

বাইরে বেরিয়ে এসে কামাল জিজ্ঞেস করল, 'কি হে, ডাকছ কেন হাত নেড়ে?

ডি. কস্টার চোখ জোড়া ছানাবড়ার মত হয়ে উঠেছে। খুব যেন আশ্চর্য হয়ে গেছে সে কোন কিছু দেখে। কামালের একটা হাত ধরে রেলিঙের ধারে টেনে আনল সে। উজ্জ্বল আকাশের দিকে আঙুল তুলে ফিসফিস করে বলে উঠল, 'ওই ডিকে টাকিয়ে ঠাকুন মি. কামাল। ডেখবেন, সসার উড়ছে।'

'সসার? কি বলছ ডি. কস্টা তুমি?' কামাল বেশ একটু অবিশ্বাসের সুরেই বলে।

ডি. কস্টা একটু রাগত স্বরেই বলে ওঠে, 'এ ডেশের লোককে নিয়া এই এক বিপড। সায়েন্সকে অবিশ্বাস করে। ভাল করে টাকিয়ে ঠাকুন, ডেখটে পাবেন।'

কামাল উজ্জ্বল আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। নির্মল আকাশের কোথাও কিছু নেই।

এদিকে ডি. কস্টা নিজের কাজ সেরে ফেলেছে। কামালের পকেটে হাত গলিয়ে দিয়ে চুপিসারে বের করে নিয়েছে সে মানি ব্যাগটা।

কামাল চোখ নামিয়ে দেখল ডি. কস্টা সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে যাচ্ছে। পিছন ফিরে তাকাল সে একবার দ্রুত। কামালের সাথে চোখাচোখি হতেই জোর গলায় বলল, 'চিন্টার কিছু নেই। হামি ফিরে এসে ডেখাব হাপনাকে সসার।'

আসাদ চৌধুরী শহীদের পুরানো বন্ধু। লন্ডনে ছিল বেশ কয়েক বছর। ঢাকায় ফিরে চিত্র প্রযোজনায় হাত দিয়েছে। কদিন আগে শহীদের বাড়িতে এসে দেখা করে গিয়েছিল সে। আজ ফোন করে ডেকে পাঠিয়েছিল শহীদকে—বিশেষ দরকার।

শহীদ ফিরল সন্ধ্যার পর। আসাদ চৌধুরীও এল ওর সাথে বাড়িতে। চা পানের পর আলোচনা প্রসঙ্গে শহীদ বলল, বুঝলে আসাদ, ছবি করার ইচ্ছা আমার কোন দিনই ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি আজও নেই তবে ছবি যদি কোন দিন করিই তাহলে কুয়াশার জীবনের বাস্তব ঘটনা নিয়ে ছবি করব।

'তাই করো না কেন।'

আসাদ বলল, 'কুয়াশা শুধু এদেশেই নয়, বিদেশেও একটি আশ্চর্য কিংবদন্তীর নায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওর জীবনের কোন ঘটনা নিয়ে ছবি করলে আমি হলপ করে বলতে পারি তা সুপার হিট হবে। কুয়াশার ভক্ত এবং শত্রু সবাই দেখবে সে ছবি।'

শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'গোয়েন্দা কাহিনী নিয়ে ছবি হচ্ছে আজকাল?'

'খুব কম।'

আসাদ বলল, 'আমার ছোট ভাই করছে। শূটিং শুরু হবে সামনের সপ্তা থেকে। গোয়েন্দা কাহিনীই, তবে ভূতটুতও বোধহয় আছে। শূটিং দেখতে যাবে?'

'কোথয় হচ্ছে শূটিং?'

'এখনও শুরু হয়নি। হলে জানাব। সাভারের তালুকদার বাড়িতে গেছ তুমি কখনও? ওখানেই শূটিং হবে।'

'সাভারের তালুকদার বাড়ি! ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। ওখানে ইমাম তালুকদার বাস করেন না?'

'হ্যাঁ! কেন, চেনো নাকি?'

'চিনি ঠিক বলা চলে না। তবে দেখেছি। একবার এক কুখ্যাত স্মাগলারকে তাড়া করেছিলাম মি. সিম্পসনকে সাহায্য করতে গিয়ে। আমার সন্দেহ হয়েছিল ওই জমিদার বাড়িতেই লুকিয়ে পড়েছিল লোকটা। মি. তালুকদারকে ডেকে কথাটা জানাই। কিন্তু তিনি আমাকে তার বাড়িতে ঢুকে তল্লাশি চালাবার অনুমতি দেননি।'

'তারপর?'

শহীদ বলে, 'আমি অবশ্যি বাড়াবাড়ি করিনি আর। কারণ পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলাম না লোকটা সম্পর্কে। হয়ত তালুকদার বাড়িতে ঢোকেনি সে। তল্লাশি চালিয়ে তাকে বের করতে না পারলে অপমান। তাছাড়া মি. তালুকদার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং বৃদ্ধ মানুষ। তার সাথে তর্ক না করেই ফিরে এসেছিলাম। পরে অবশ্যি ওই জমিদার বাড়ি সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি।'

'কি কি শুনেছ?'

শহীদ বলল, 'অলৌকিক সব ব্যাপার ঘটে নাকি ওখানে। অবিশ্বাস্য সব গুজব লোকমুখে শোনা যায়। তা মি. তালুকদার রাজী হয়েছেন শূটিং করতে দিতে? শুনেছিলাম বাড়ির ভিতর কাউকেই ঢুকতে দেন না।'

'পয়সা দিলে দেয় নিশ্চয়।'

আসাদ বলল, 'আমার ছোট ভাইয়ের প্রযোজক নাকি দশ হাজার টাকা দিয়ে রাজী করিয়েছে।'

শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ছোট ভাই...।'

'ও ছবিটা পরিচালনা করছে।'

শহীদ বলল, 'তাহলে সুযোগটা হাত ছাড়া করা উচিত হবে না। বাড়ির ভিতরটা একবার দেখে আসতে হবে।'

আসাদ বলল, 'আমি তোমাকে খবর দেবো'খন।' এরপর ওদের আলোচনা শুরু হল দেশের বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থা সম্পর্কে।

*

একে একে কেটে গেল তিন চার দিন। শহীদ কাজের চাপে ভুলেই গিয়েছিল সাভারের জমিদার বাড়িতে শূটিং দেখতে যাবার কথা। কিন্তু শহীদ ভুললে কি হবে, মনে করিয়ে দেবার লোক আচমকা উপস্থিত হল একদিন।

না, সে আসাদ চৌধুরী নয়।

লোকটিকে শহীদ চিনতে পারল না। সকাল বেলা সবেমাত্র বৈঠকখানায় এসে বসেছে শহীদ। গফুর এসে জানাল এক ভদ্রলোক দেখা করতে চায় তার সাথে। শহীদ নিয়ে আসতে বলল ভদ্রলোককে।

ভদ্রলোককে নিয়ে প্রবেশ করল গফুর কামরায়। চোখ তুলে ভদ্রলোককে দেখল শহীদ। বলল, 'বসুন।'

ভদ্রলোক বসলেন। গফুর চলে যেতে শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি?'

ভদ্রলোক মাথা নিচু করে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর মুখ তুলল।

বলল, 'আপনাকে কয়েকটি তথ্য দেব আমি। তথ্যগুলো কোথায় পেলাম তা জিজ্ঞেস করতে পারবেন না।'

শহীদ খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছে ভদ্রলোকটিকে। ধূপদুরস্ত পোশাক। দামী সিগারেট টানছে। মাথার মাঝখানে চুল নেই। দামী সেন্ট মেখে এসেছেন। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। ভদ্রলোক একটু ট্যারাও।

'আপনার নামটা জানতে পারি কি?'

'না।'

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, 'আপনার কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারব না আমি।'

শহীদ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, 'বেশ, বলুন।'

ভদ্রলোক সিগারেট ধরিয়ে টান দিয়ে টেবিলের মাঝখানে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'সাভারের তালুকদার কটেজ চেনেন?'

'চিনি। কেন বলুন তো?'

একটু অবাকই হয় শহীদ।

'ওখানে হানা দিন। অনেক টাকার চোরাই সোনার গহনা এবং দামী হীরে পাবেন। চোখ কান খোলা রাখবেন। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপও বেরিয়ে পড়তে পারে।'

মাত্র এই কটি কথা বলেই উঠে দাঁড়াল ভদ্রলোক। শহীদ কিছু বলবার আগেই দরজার দিকে পা বাড়াল সে।

শহীদ ডাকল, 'শুনুন।'

কিন্তু ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়াল না, থামলও না।

দরজার কাছে গিয়ে বাধা পেল ভদ্রলোক। শহীদ দেখল সিভিল ড্রেসে ওর পূর্ব পরিচিত ইন্সপেক্টর আজমল হুদা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ভদ্রলোকের পথ

আটকে কঠিন কণ্ঠে বলে উঠলেন হুদা, 'খবরদার! নড়বেন না, কুদ্দুস সাহেব!'

আজমল হুদার হাতের পিস্তলটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে শহীদ। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও। বলল, 'ব্যাপার কি, হুদা সাহেব?' হুদা সাহেব উত্তর দেবার আগেই ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়াল। মৃদু হাসি তার ঠোঁটে। পরাজয়ের হাসি। বলল, 'ব্যাপার গুরুতর, মি. শহীদ। আমার কপাল খারাপ। ধরা পড়ে গেছি আমি।'

গ্রেফতারি পরোয়ানা দেখিয়ে কুদ্দুস সাহেবকে গ্রেফতার করলো ইন্সপেক্টর। পকেট থেকে হাতকড়া বের করে পরিয়ে দিল একজন সেপাই। শহীদের উদ্দেশে বলল হুদা, 'ইনি হচ্ছেন কুদ্দুস সাহেব। পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে চোরাই মাল কেনা বেচা করে আসছেন বেশ কয়েক বছর ধরে। এর বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ আছে আমাদের হাতে। কিন্তু পাত্তা পাওয়া যাচ্ছিল না। কদিন ধরেই ছায়ার মত ঘুরছি এর পিছনে। আজ একেবারে সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেলাম। কিন্তু, মি. শহীদ, আপনার কাছে কেন এসেছিলেন ইনি?'

কুদ্দুস সাহেব বলে উঠল, 'এক সমব্যবসায়ীর সর্বনাশ করতে গিয়ে আজ আমার এই অবস্থা। মি. শহীদ, দয়া করে আপনাকে আমি যা বলেছি ভুলে যান। পুলিসকে কথাটা জানাবেন না। আর আপনিও সেখানে যাবেন না।'

শহীদ হেসে ফেলল কুদ্দুস সাহেবের কথা শুনে। বলল, 'ধরা পড়ে আপনার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে, কুদ্দুস সাহেব। ছুঁড়ে দেয়া ঢিল কি হাতে ফিরে আসে? বৃথা চেষ্টা করছেন আপনি।'

দুই

বন্ধু আসাদ চৌধুরীকে দিয়ে আগে থাকতেই সব ব্যবস্থা সেরে রেখেছিল শহীদ। আসাদ তার ছোট ভাই পরিচালক আহাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে শহীদের। ছদ্মবেশে, ছদ্ম পেশায় পরিচিত হয়েছে শহীদ।

শহীদের নাম কায়েস আহমেদ। পেশায় সে সিনেরিপোর্টার।

যাত্রা শুরু হল আরও দুই দিন পর। প্রথম গাড়িতে চেপে বসল আহাদ এবং তার স্ত্রী মিসেস আহাদ। স্বামী-স্ত্রী বসল সামনের সীটে। ড্রাইভ করছে আহাদ নিজেই। পিছনের সীটে প্রডিউসার মি. আকবর হোসেন এবং কায়েস আহমেদ, মানে শহীদ।

পরিচালক আহাদ অল্প বয়েসী যুবক। ত্রিশ বছর বয়সেই সে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে। বর্তমান ছবিটা তার পরীক্ষামূলক। একটি ভৌতিক কাহিনীকে ভিত্তি করে লেখা উপন্যাসের চিত্ররূপ দিতে যাচ্ছে সে। মিসেস আহাদ অপূর্ব সুন্দরী। তেইশ-চব্বিশ বছর বয়স। প্রডিউসার মি. আকবর হোসেন স্বাস্থ্যবান। পেশীবহুল দেহ। বড় মুখ। ছোট ছোট চুল মাথায়। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়েস।

পরিচালক এবং প্রযোজক—এ দুইয়ের সম্পর্ক সাধারণত আপসমূলক হয়ে থাকে। কিন্তু এদের দুজনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত। ওরা দুজন সবসময় তর্ক করেন। একে অপরকে ব্যঙ্গ করে কথা বলেন। ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু। শহীদের কাছে একটু আশ্চর্যই ঠেকল। মনে মনে ধারণা করল ও যে নিশ্চয়ই এর পিছনে কোন কারণ আছে।

গাড়ি ছুটে চলেছে। মি. আকবর হোসেন বলল যে-বাড়িতে যাচ্ছি সেটা নাকি ভূতুড়ে বাড়ি। ভৌতিক ছবি করতে গিয়ে আবার পৈত্রিক প্রাণটা না হারিয়ে ফেলি।

হেসে উঠল পরিচালক আহাদ। গাড়ি চালাতে চালাতে সে শহীদের উদ্দেশ্যে বলে উঠল, 'ওর কথায় কিছু মনে করবেন না, মি. কায়েস। প্রডিউসাররা অবাস্তব কল্পনা করতে ওস্তাদ।'

মি. আকবর যেন ঝাঁকাল কণ্ঠে বলল, 'মোটেই না। ওরকম ঘটনা ইউরোপে দু'একটা ঘটেছে। আমি প্রমাণ করে দিতে পারি।'

কায়েস আহমেদ ওরফে শহীদ মৃদু হেসে বলল, 'আমি আপনাদের ব্যক্তিগত কলহে আগ্রহী নই। আমার অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে কি ভাবে একটি ছবি তোলা হয় তার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা।

পিছনের গাড়িতে ছবির নায়ক-নায়িকা। বাকি সবাই আসবে পরে।

নায়ক স্বপন সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান। নায়িকা সুবিতা রূপবতী যুবতী।

গাড়ি চালাচ্ছে নায়ক স্বপন। নায়িকা রাস্তার দুই ধারের গ্রামের দৃশ্য দেখতে দেখতে একসময় বলল, 'স্বপন, কাজটা তুমি ভাল করছ না।'

'মানে? কোন্ কাজের কথা বলছ তুমি, সবিতা?'

'জানো না কোন্ কাজের কথা বলছি?'

একটু বিরক্ত হয়ে উঠল স্বপন। বলল, 'কি ব্যাপার, আজ তুমি এমন হেঁয়ালিপনা করছ কেন আমার সাথে?'

সবিতা সরাসরি তাকাল স্বপনের দিকে। বলল, 'মিসেস আহাদের সাথে তোমার সম্পর্কটা দিনে দিনে সিরিয়াস...।'

'চুপ করো সবিতা।'

স্বপন ধমকে ওঠে, বলে, 'যা জানো না সে সম্পর্কে কোন কথা বলা উচিত নয় তোমার।'

'তোমাদের সম্পর্কটা খুব বেশিদিন গোপন থাকবে না, স্বপন। আহাদ সাহেব জানতে পারলে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে ছাড়বেন। যা রাগচটা লোক!

'ওর স্ত্রী আমার ছোট বোনের মত, সবিতা। কথাটা মনে রেখো। তোমার কাছ থেকে এ সম্বন্ধে আর কোন কথা আমি শুনতে চাই না।'

রাগে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে জানালা পথে বাইরের দিকে তাকাল সবিতা। কথা

বলল না।

তালুকদার কটেজের সামনে দাঁড়াল গাড়ি বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। একে একে নামল সবাই। প্রকাণ্ড গেট। বন্ধ। দোতলা বাড়ি। উঁচু দেয়াল দিয়ে বাড়ির গোটা চৌহদ্দী ঘেরা। পাঁচিলের চেহারা বিবর্ণ, চুনকালি খসে পড়েছে বহু বছর আগে। উঁচু পাঁচিলের জন্যে এক তলার কামরাগুলোর দরজা জানালা দৃষ্টিগোচর হল না। শহীদ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল বাড়িটার হাল। উপরের কামরাগুলোর জানালা সব ক'টা বন্ধ। বিকেলের পড়ন্ত রোদ লেগে বাড়িটা এতটুকু উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। বাড়ির ভিতর যে মানুষ বাস করে তা সহজে বিশ্বাস হয় না।

লোহার গেটের গায়ে বড় একটা লোহারই কড়া। কলিং বেল নেই। কড়া ধরে নাড়ল অনেকক্ষণ মি. আকবর হোসেন।

কিন্তু ভিতর থেকে কারও কোন সাড়াশব্দ এল না।

মিনিট ছয়েক পর বিরক্ত হয়ে আহাদ চৌধুরী বলে উঠল, 'যা হবার তাই হয়েছে এখানেও। জানি, শেষ অবধি একটা না একটা অসুবিধে দেখা দেবেই। আকবর সাহেব, আপনি আরও খোঁজ নেননি? আমার তো মনে হচ্ছে বাড়ির ভিতর কেউ নেই।'

শহীদ কয়েক পা পিছিয়ে এসে নায়ক স্বপন, নায়িকা সবিতা এবং মিসেস আহাদের কাছে দাঁড়াল। সবিতা বলে উঠল, 'ওই যে, ওরা আবার তর্ক-বিতর্ক শুরু করে দিয়েছেন!'

এমন সময় প্রকাণ্ড গেটটা খুলে যেতে শুরু করায় সবাই তাকাল সেদিকে।

গেটটা খুলে গেল অনেকটা। একজন লম্বা চওড়া লোক হাঁ করে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

লোকটা যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। ময়লা পোশাক। চাকর বাকরই হবে। কিন্তু গোঁফটা রাজাবাদশাদের মত বিরাট এবং মোম দিয়ে পাকানো। নাকের মাঝখানে একটি গোল তিল। একটা আঁচিল ডান চোখের ঠিক উপরেই।

মি. আকবর হোসেন ব্যাখ্যা করে বলল তাদের এখানে উপস্থিত হবার কারণ। কিন্তু লোকটি বলল, 'আমার নাম সুরত আলী। এ বাড়ির চাকর, হুজুর। আপনাদের সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।'

'অসম্ভব!'

চিৎকার করে উঠল মি. আকবর হোসেন, 'তোমার মালিক মি. তালুকদারকে ডাকো। তিনি নিজে সই করেছেন চুক্তিপত্রে। দেড়মাসের জন্যে শূটিং করার অনুমতি দিয়েছেন তিনি!'

সুরত আলী বলে উঠল, 'বলেন কি, হুজুর। আমাদের মালিক সাধারণত কারও সাথে দেখাই করেন না। ঠিক আছে, মালিকের সাথেই কথা বলুন।'

লোকটা চলে গেল।

শহীদ লক্ষ করল লোকটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। বেশ একটু কুঁজোও সে।

মিনিট পাঁচেক পর মি. তালুকদার গেটে এসে হাজির হলেন। শহীদ দেখল ভদ্রলোক আগের চেয়ে বেশি বুড়ো হয়েছেন। ধীরে ধীরে হাঁটেন। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে! কথা বলেন আস্তে আস্তে। কালো স্যুট পরেছেন তিনি। কপালে ভাঁজ পড়েছে। বয়সের স্থূল ভাঁজ মুখেও প্রকট হয়ে উঠেছে।

মি. তালুকদার ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বললেন, 'আমি দুঃখিত। গতকাল মাত্র বিদেশ থেকে এসেছি আমি। এসে দেখি আমার সেক্রেটারি তার অসুস্থ এক আত্মীয়কে দেখতে গ্রামের বাড়িতে চলে গেছে। কিন্তু একটা চিঠি লিখেও তো সে রেখে যেতে পারত। হয়ত ভুলে গেছে...।'

মি. আকবর হোসেন তিক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু সে কি দশ হাজার টাকার চেকটিও আপনার জন্যে রেখে যেতে ভুলে গেছে!'

'দশ হাজার টাকার চেক!'

মি. তালুকদার সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। তারপর নিরাশায় ভেঙে পড়ে বলে উঠলেন সর্বনাশ হয়ে গেছে আমার। সে তো তাহলে ছুতো দেখিয়ে পালিয়েছে। ঠগ, বদমাশ, জোচ্চর, নেমকহারাম...।

মি. আকবর বলে উঠলেন, 'এখন আমরা কি করব তাই বলুন।'

মি. তালুকদার বললেন, 'আমি কক্ষণো আপনাদেরকে এখানে আসার অনুমতি দিইনি। আমার জোচ্চর সেক্রেটারির কাজ এটা। আপনারা আমাকে বাধ্য করতে পারেন না...।'

এমন সময় বাড়ির ভিতর থেকে আবার সেই সুরত আলী এসে দাঁড়াল গেটের সামনে। বলল, 'আপনাদের মধ্যে আহাদ চৌধুরী কে? তার ফোন এসেছে ঢাকা থেকে।'

আহাদ শহীদের উদ্দেশ্যে বলল, 'কায়েস সাহেব, আসুন আমার সাথে। আর আকবর সাহেব, আপনি যেভাবে হোক একটা ব্যবস্থা করুন। ফিরে এসে যেন দেখতে পাই সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে।'

গেট পেরিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকতে ঢুকতে শহীদ ঘাড় ফিরিয়ে পিছন ফিরে দেখল স্বপন, সবিতা এবং মিসেস আহাদ হাঙ্গামা থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে।

ফুটবল খেলার মাঠের মত উঠান বাড়িটার। উঠানের পর অস্বাভাবিক উঁচু বারান্দা।

বেশ প্রশস্ত বারান্দা। বারান্দার মেঝে চটে গেছে জায়গায় জায়গায়। কামরাগুলোর সব দরজাই বন্ধ। পাশাপাশি কামরা। দুটো পাশাপাশি কামরার পরই অস্বাভাবিক সরু প্যাসেজ। দিনের বেলাতেও প্যাসেজগুলো বেশ অন্ধকার। আলো

বাতাস নেই। উপরে টিনের শেড বলেই সম্ভবত।

একটা প্যাসেজ ধরে সুরত আলীর পিছু পিছু এগিয়ে চলল ওরা। প্যাসেজের বাঁ দিকে একটি মোড়। মোড় নিয়ে দশ-বারো হাত এগোবার পরই হলরুম।

বড় অদ্ভুতভাবে সাজানো রুমটা। লোহার মূর্তি বেশ কয়েকটা। যুদ্ধের পোশাক পরা। দেয়ালে দেয়ালে ঢাল-তলোয়ার ঝুলছে! ভোজালি, বর্মণ, বাঘের ছাল, আবক্ষ নারীমূর্তি এমনি সব হাজারো জিনিস। হলরুমের দেয়াল ঘেঁষে সিঁড়ি। প্যাসেজের দেয়ালের মতই সিঁড়ির পাশের দেয়ালটা ভিজে ভিজে। চুন-বালি ওঠা।

দোতলার বারান্দাটাও বেশ চওড়া। আলো বাতাস ঢোকার কোন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। বারান্দার সর্ব দক্ষিণে মি. তালুকদারের বৈঠকখানা।

সুরত আলীর পিছু পিছু কামরাটার ভিতরে ঢুকল ওরা দুজন। ফোনটা এ কামরাতেই।

ফোন করেছে আহাদের সহকারী। শূটিঙের সাজসরঞ্জাম যোগাড় করে ঢাকা থেকে রওনা হতে ঘন্টা দেড়েক দেরি হবে আরও। এই খবরটাই দেবার জন্যে ফোন করেছে সে। আহাদ রীতিমত ধমকে উঠল সহকারীকে। বলল, 'আজ রাতে শূটিং শুরু করতে হবে। যত তাড়াতাড়ি পারো সবাইকে নিয়ে চলে এসো।'

ফোনের কাজ সেরে নিচে নেমে এল ওরা। মি. আকবর হোসেন আহাদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, 'সব ঠিক করে ফেলেছি। মি. তালুকদার লাইটেরও ব্যবস্থা করবেন কথা দিয়েছেন।'

মি. তালুকদার হাসিমুখে বললেন, 'মাফ করবেন, আমাকে উপরতলায় যেতে হচ্ছে চাবি বের করার জন্যে। আপনাদের রুমগুলো খুলে দিচ্ছি এখুনি আমি। দয়া করে নিচের তলায় বসুন কিছুক্ষণ। সুরত আলী একটি কামরা খুলে দেবে।'

শহীদ চিন্তা করে কি যেন বোঝার চেষ্টা করছিল। অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটে গেছে। কিন্তু কি যে ঘটেছে তা বুঝতে পারছে না ও।

তিন

একতলার মাঝামাঝি জায়গায় একটি কামরা পেল শহীদ। কামরাটার সামনে বারান্দা নয়, সরু একটা প্যাসেজ। প্রায় অন্ধকার। দরজা ছাড়া মোট চারটে জানালা। জানালাগুলো কামরার ডান এবং বাঁ দিকের দেয়ালে। জানালার পর সরু প্যাসেজ।

শহীদের কামরার আশপাশের কামরাগুলোয় কেউ থাকছে না। সেগুলো অপরিষ্কার, অব্যবহৃত। কোনটার দরজা ভাঙা। কোনটা তালা মারা।

বাড়ির সামনের দিকে আহাদ এবং তার স্ত্রীর কামরা। নায়ক নায়িকা থাকছে পাশাপাশি কামরায়, বাড়ির সর্ব পুবে। প্রডিউসার মি. আকবর হোসেন থাকছেন দোতলার একটি কামরায়।

নিচের তলায় আরও কয়েকটি কামরা খুলে দেয়া হয়েছে। কলাকুশলী,

ক্যামেরাম্যান থাকবে। সকলের ব্যবহারের জন্যে একটি বৈঠকখানাও পাওয়া গেছে। সেটিও আহাদ চৌধুরীর কামরার অদূরেই।

ইতিমধ্যে বাড়ির চাকরানীর মুখদর্শন করেছে শহীদ। বৈঠকখানায় ওরা সবাই যখন বসেছিল তখন সুরত আলীর সাথে সে চায়ের ট্রে হাতে নিয়ে ঢুকেছিল কামরায়।

লম্বা, রোগা মেয়েলোক। আধহাত ঘোমটা, মুখটা সবটুকু ঢাকা পড়েছে। শাড়ী দিয়ে সবটুকু শরীর ঢাকা হলেও শহীদ মেয়েলোকটার পুরুষালী কাঠামো দেখে একটু অবাকই হয়েছে।

সুরত আলী কথা প্রসঙ্গে জানাল যে পটলার মা বোবা।

সুরত আলী খানিক পরই সবাইকে যে-যার কামরায় পৌঁছে দিল। মি. তালুকদার সেই যে উপরতলায় গিয়ে উঠেছেন তারপর আর নামেননি। বেশ বোঝা যায়, ভদ্রলোক তেমন মিশুক নন। লোকজনের ভিড় পছন্দ করেন না তিনি।

বাক্স-পেটরা খুলে সংলগ্ন বাথরুমে ঢুকে শহীদ স্নান করে নিল। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নেমেছে।

ইলেকট্রিক বাল্‌ব জ্বলছে কামরার ভিতর। কিন্তু কামরার ভিতরটা তেমন আলোকিত হয়ে ওঠেনি। দেয়ালগুলো বিবর্ণ। কামরাটা প্রকাণ্ড। চল্লিশ পাওয়ারের বাল্‌ব যথেষ্ট নয়।

কাপড়-বদলে নিজের কামরায় তালা দিয়ে শহীদ বেরিয়ে পড়ল মি. আকবর হোসেনের উদ্দেশে। ইন্টারভিউ নেয়া দরকার ভদ্রলোকের। সরু প্যাসেজে আলো নেই। দূরবর্তী কোন বারান্দা বা কামরার ভিতর থেকে মৃদু আলোর আভা এসে পড়েছে প্যাসেজগুলোয়। সামনের দিকে চোখ রেখে বারান্দার দিকে এগোতে থাকে শহীদ।

মোড় নিয়েই থমকে দাঁড়ায় শহীদ। পিছিয়ে আসে ও। দুজনার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। উঁকি মেরে দেখল শহীদ।

মিসেস আহাদকে জড়িয়ে ধরেছে প্যাসেজের সামনের মোড়ে মি. আকবর হোসেন। জায়গাটা প্রায় অন্ধকার হলেও ছায়ামূর্তি দুটোকে চিনতে পারে শহীদ ওদের কণ্ঠস্বর শুনে।

মিসেস আহাদ নিজেকে মুক্ত করার জন্যে ছটফট করছে। চাপা কণ্ঠে বারবার বলছে সে, 'ছেড়ে দিন বলছি, উহ্ঃ, লাগছে আমাকে···ছেড়ে দিন বলছি···!'

মি. আকবরের মৃদু হাসি শোনা যায়। তারপর তার কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'ঠিক আছে, আজ তোমাকে রেহাই দিচ্ছি, সুন্দরী! কিন্তু আর একটাদিন মাত্র ধৈর্য ধরব আমি। ঠাট্টা করছি না, মনে রেখো কথাটা।'

মিসেস আহাদকে ছেড়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় অন্ধকার প্যাসেজে মি. আকবর।

শহীদ আড়াল থেকে বেরিয়ে এগিয়ে যাবে কিনা ভাবছিল এমন সময় মিসেস আহাদের গলা শোনা যায়, 'কে?'

'আমি, স্বপন।'

শহীদ দেখে স্বপন অন্য এক প্যাসেজ থেকে মিসেস আহাদের সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'কার সাথে কথা বলছিলে, লিলিদি?'

লিলি মিসেস আহাদের নাম।

'কুকুরটা আজও আমাকে ধরেছিল, স্বপন।'

কুকুরটা হুমকি দিয়েছে তোমার আমার সম্পর্ক ফাঁস করে দেবে বলে। আমি এখন কি করব বলো তো?

'আহাদ ভাইকে বলা চলবে না। যা রগচটা আর সন্দেহ প্রবণ। তিনি হয়ত কুকুরটার কথাই বিশ্বাস করবেন···। চলো, তোমাকে পৌছে দিই।'

স্বপন মিসেস আহাদকে নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

শহীদ প্যাসেজ ধরে বারান্দায় আসে। বৈঠকখানায় কাউকে দেখতে না পেয়ে হলরুমের দিকে পা বাড়ায় ও।

হলরুমে ঢুকে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে অকারণেই থমকে দাঁড়ায় শহীদ। অদ্ভুত একটা অনুভূতি জাগে মনে। কারা যেন তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। এদিক ওদিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখে শহীদ।

হলমরুম নয়, যেন ছোটখাটো একটা মিউজিয়াম। চার কোণে চারটে লোহার মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। মাথার উপর তিনটে ঝাড় বাতি। দেয়ালে দেয়ালে ঢাল, তলোয়ার, ছোরা, গদা, মুগুর, বর্শা, ভোজালি, বাঘের ছাল, নর কঙ্কাল, আবক্ষ নারীমূর্তি।

শহীদ যেন ভুলে যায় ওর গন্তব্যস্থল। সিঁড়ির দিকে না এগিয়ে পা বাড়ায় ও একটি লোহার সৈনিকমূর্তির দিকে।

দেয়ালে পিঠ ঠেকানো সৈনিকমূর্তি। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে শহীদের দুটি চোখ। এক'পা এক'পা করে সৈনিকমূর্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ও।

লোহার সৈনিকমূর্তির চোখ জোড়া যেন জ্বলছে। যেন নড়ছে। ব্যাপার কি?

মাত্র তিন হাত সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে শহীদ। মূর্তিটা যেন চোখের ইঙ্গিতে কি বলতে চাইছে। পলক পড়ে না শহীদের চোখে। একটু যেন নড়ে উঠল মূর্তিটা। ঝট্ করে মূর্তির হাত দুটোর দিকে তাকাল শহীদ। একটু যেন নড়ে উঠেছিল হাত দুটো। তাকাতেই থেমে গেল। মূর্তির চোখ দুটো আকর্ষণ করছে শহীদকে প্রবলভাবে। নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে শহীদ। তারপর অকস্মাৎ বিদ্যুৎবেগে লাফ দিয়ে সরে যায় ও।

মূর্তিটা এগিয়ে আসছে। না, ঠিক এগিয়ে আসছে না। ঢলে পড়ে যাচ্ছে শহীদের উপর।

চোখের পলকে পাশের দেয়াল থেকে একটা লোহার ভারি মুগুর তুলে নিয়ে সজোরে মূর্তির ঘাড় লক্ষ্য করে আঘাত হানে শহীদ।

প্রচণ্ড শব্দ হয়। মূর্তির ধড় আর মুণ্ডু আলাদা হয়ে গড়িয়ে পড়ে মেঝেতে।

নিষ্প্রাণ লৌহমূর্তি। কিন্তু শহীদ ভুল দেখেনি। বসে পড়ে ও মুণ্ডুটার পাশে। মুণ্ডুটা ধরবার জন্যে হাত বাড়াতে গিয়ে ঝট্ করে খোলা দরজার দিকে তাকায় ও। শাঁ করে কে যেন সরে যায় দরজার কাছ থেকে। একলাফে উঠে দাঁড়িয়েই ছুটতে শুরু করে শহীদ।

হলরুম থেকে বেরিয়ে প্যাসেজে কাউকে দেখতে পায় না শহীদ। কে যেন পালাচ্ছে। পদশব্দ অনুসরণ করে আবার ছুটতে শুরু করে ও।

বাতাসে মিলিয়ে যায় পদশব্দ। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে শহীদ। পালিয়ে গেছে।

লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিল ওকে কেউ? কিন্তু কে লোকটা?

অন্যমনস্কভাবে হলরুমে ঢোকে শহীদ। মেঝের দিকে চোখ পড়তেই ছ্যাঁৎ করে ওঠে বুকটা। লৌহ-মূর্তির ধড় বা মুণ্ডু কোনটাই নেই।

বাকি তিনটে মূর্তি রুমের তিনকোনায় আগের মতই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু অন্যটি কোথাও নেই।

ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলে শহীদ। হলরুমের দেয়ালগুলো দ্রুত পরীক্ষা করতে শুরু করে ও।

মিনিট দশেক পর ব্যর্থ হয়ে কপালের ঘাম মোছে শহীদ রুমাল বের করে। কো গোপন পথ পায়নি ও দেয়ালে।

সিঁড়ি বেয়ে সোজা উপরে উঠে আসে এবার শহীদ। মি. আকবর হোসেনের কামরাটা দোতলার পিছন দিকে। সেদিকে না গিয়ে মি. তালুকদারের কামরার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় ও।

'কে?'

শহীদ খোলা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই স্বল্পালোকিত কামরা থেকে মি. তালুকদারের গলা শোনা যায়।

'আমি কায়েস আহমেদ।' শহীদ বলে।

'ভিতরে আসুন। আমি জানতাম আপনারা কেউ না কেউ আসবেন। সেজন্যেই দরজা খুলে অপেক্ষা করছি।'

শহীদ কেমন যেন ইতস্তত করে একটু। কামরার ভিতর বৈদ্যুতিক আলোর বদলে একটি টেবিলের উপর মিট মিট করে জ্বলছে একটি কেরোসিন ল্যাম্প। ল্যাম্পের মাথায় শেড পরানো। টেবিলের ওধারে বসে আছেন মি. তালুকদার।

গা ছমছম করে ওঠে শহীদের। মৃদু শব্দে খুক করে কাশে একবার। একপা একপা করে টেবিলটার সামনে গিয়ে ও দাঁড়ায়। কাছেই একটা বিড়াল ডেকে ওঠে

ম্যাও!

'বসুন!'

মি. তালুকদার যেন ব্যঙ্গ করে উচ্চারণ করলেন শব্দটা। শহীদ হাতলহীন চেয়ারটায় বসল। টেবিলের উপর স্ট্যান্ডে একটি ডানা মেলা বাজ পাখির বিরাট পাথরমূর্তি।

একটু আগের ঘটনাটা ধীরে ধীরে বলে যায় শহীদ। মি. তালুকদার সব কথা শুনে বললেন, 'এরকম যে ঘটবে তা আমি জানতাম। আপনাদের এ বাড়িতে আসা মোটেই উচিত হয়নি।'

'কেন?' প্রশ্ন করে শহীদ। শান্ত হয়ে উঠেছে ও ইতিমধ্যে। মি. তালুকদার হঠাৎ কার উদ্দেশ্যে যেন বলে ওঠেন, 'আয়, মিনি, আয়।'

বৃদ্ধের কথা শেষ হতেই কুচকুচে একটি কালো বিড়াল অন্ধকার থেকে লাফ দিয়ে টেবিলের মাঝখানে উঠে পড়ে।

শহীদের দিকে জ্বলন্ত একজোড়া চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে বিড়ালটি।

শহীদ ঢোক গেলে। এমন কালো বিড়াল বড় একটা দেখা যায় না। লেজ নাড়ার ভঙ্গিটিও অদ্ভুত। যেন আক্রমণের পূর্ব মুহূর্তে প্রস্তুতি নিচ্ছে জানোয়ারটা।

'বাড়িটা অতৃপ্ত আত্মাদের দখলে চলে গেছে। বড় ভয়ঙ্কর ওরা। আমাকে এবং আমার দু'একজন চাকর চাকরানীকে ছাড়া আর কাউকে পছন্দ করে না। হায় খোদা, না জানি কি আছে আপনাদের কপালে!

শহীদ বলে, 'আপনি শিক্ষিত মানুষ হয়ে এই সব ব্যাপার বিশ্বাস করেন, মি. তালুকদার?'

'বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। যা সত্যি তাকে অস্বীকার করব কি করে? আপনি কি বলেন? যা দেখেছেন তার ব্যাখ্যা করতে পারবেন?'

শহীদ কিছু একটা বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে রাখল। খানিক পর বলল, 'আমি জানি না।'

'সময় এখনও পেরিয়ে যায়নি, মি. কায়েস।' মি. তালুকদার চাপা কণ্ঠে বললেন, একটু ঝুঁকে পড়লেন তিনি টেবিলের দিকে, 'এখনও কোন বিপদ ঘটেনি। চলে যান, সবাইকে নিয়ে পালিয়ে যান ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে যাবার আগেই। ওরা হয়ত দ্বিতীয়বার সাবধান করে নাও দিতে পারে।'

'কাদের কথা বলছেন আপনি?' শহীদ একটু জোর গলাতেই প্রশ্ন করে।

'অতৃপ্ত আত্মাদের কথা বলছি আমি।' ফিসফিস করে উচ্চারণ করেন মি. তালুকদার।

কালো বিড়ালটার জ্বলন্ত দুই চোখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে থেকে উঠে

দাঁড়ায় শহীদ সিধে হয়ে। বলে, 'আমি ওসব বিশ্বাস করি না, মি. তালুকদার। আপনারও বিশ্বাস করা উচিত নয়। যাকগে, আমি চললাম।'

বেরিয়ে আসে শহীদ রহস্যময় ভদ্রলোকের কামরা থেকে।

চার

সিঁড়ি বেয়ে হলরুমে নেমে খানিকক্ষণ অকারণেই দাঁড়িয়ে রইল শহীদ। কোথাও কোন নড়াচড়া নেই, শব্দ নেই। আলোছায়ার মধ্যে মিনিট দুয়েক দাঁড়িয়ে থাকার পর কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল শহীদের। বাতাস দরকার। হলরুম থেকে বেরিয়ে প্যাসেজ ধরে এগোতে এগোতে কার যেন গলা শোনা গেল। পরিচিত গলা। সন্দেহ হলো। কিন্তু কান পেতে পরিষ্কারভাবে শোনার অবসর পেল না শহীদ। মোড় নিতেই ও দেখতে পেল পটলার মা'কে।

পটলার মা হন হন করে চলে যাচ্ছে। মেয়েলোকটা নাকি বোবা। কিন্তু কথা বলছিল কে তবে?

পটলার মা পিছন ফিরে তাকাতেই চোখাচোখি হল। শহীদ হাত দেখিয়ে থামতে নির্দেশ দিল।

দাঁড়িয়ে পড়ল পটলার মা। ঘোমটাটা গলা অবধি টেনে দিয়ে প্যাসেজের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। শহীদ পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'কার সাথে কথা বলছিলে তুমি, পটলার মা?'

পটলার মা নিরুত্তর। শহীদ এবার অন্যভাবে প্রশ্ন করল, 'কে কথা বলছিল তোমার সাথে?'

পটলার মা শহীদের দিকে না তাকিয়েই অবোধ স্বরে গাঁইগুঁই করে কি যেন বলল। কিছুই বুঝতে পারল না শহীদ। বিরক্ত হয়ে ও বলল, 'পথ ছাড়ো।'

পটলার মা পথ থেকে সরে দাঁড়াল। পাশ কাটিয়ে হন হন করে এগিয়ে গেল শহীদ। বারান্দায় এসে শহীদ কিন্তু দেখতে পেল না কাউকেই।

শহীদ অদৃশ্য হয়ে যেতে প্যাসেজের দেয়াল দুই ফাঁক হয়ে গেল ধীরে ধীরে। বেশ খানিকটা ফাঁক হতে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল পটলার মা'র সামনে একটি ছায়ামূর্তি।

ছায়ামূর্তি বৃদ্ধ। বয়সের ভারে নুয়ে পড়ছে যেন সে। পটলর মা'কে সে জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা কে?'

'জানি না।'

ছায়ামূর্তি বৃদ্ধ বলল, 'যা বলছিলাম। তোমার ফ্রেন্ডকে বলো যে বাড়ির আশপাশের কোথাও খুঁজতে বাকি রাখিনি আমি। আমার ধারণা লাশটা পাওয়া যাবে বাড়ির পিছনের বাগানে। আজ রাতেই আমরা খোঁজ করব ওখানে। কেমন?'

পটলার মা কোমর থেকে একটা দেশি সিগারেট বের করে অগ্নিসংযোগ করে

মাথা নেড়ে জানাল ঠিক আছে।

বাড়ির উত্তর দিকের একটি কামরায় শূটিঙের প্রস্তুতি চলছে। আহাদ চৌধুরী শহীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল ক্যামেরাম্যানের।

ক্যামেরাম্যান এবং তার একজন সহকারী খানিক আগে এসে পৌঁছেছে।

শহীদ লৌহ-মূর্তির ঘটনাটা বলতে চাইল আহাদকে। আহাদ মৃদু হেসে বলে উঠল, 'ওসব কথা এখন নাই বা শোনালেন, মি. কায়েস। এমনিতেই জীবিত মানুষদের আত্মা আমাকে যথেষ্ট কষ্ট দিচ্ছে। এরপর মৃতদের আত্মা যদি মাথায় এসে চাপে তাহলে মারা পড়ব নির্ঘাৎ।'

শহীদ বলল, 'আপনি আমার কথা বুঝি বিশ্বাস করতে পারছেন না?'

সুইচ টিপে আলোর তেজ পরীক্ষা করতে করতে আহাদ বলল, 'একশোবার বিশ্বাস করি। কিন্তু এই মুহূর্তে অন্য কোন বিষয়ে মাথা ঘামানো আমার পক্ষে অসম্ভব।'

মিসেস আহাদ কামরায় ঢুকে বলে উঠলেন, 'ওর মাথা এখন গরম হয়ে আছে, মি. কায়েস। চলুন, আমরা স্বপনের কামরায় যাই।'

শহীদকে নিয়ে মিসেস আহাদ বেরিয়ে এল।

স্বপনের কামরায় স্বপনকে পাওয়া গেল। হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির সামনের বারান্দায় চলে এল ওরা। হালকা কথাবার্তা বলতে বলতে দক্ষিণ দিকে এগোচ্ছিল ওরা। হঠাৎ মিসেস আহাদ বলল, 'আমাদের কামরাটা কেমন যেন।'

'কেমন যেন মানে?' জিজ্ঞেস করল শহীদ।

'তিনটে দরজা। তারমধ্যে দুটোই বন্ধ। বন্ধ দরজা দুটোর ওদিকে বোধহয় আরও কামরা আছে। খুটখাট করে শব্দ হচ্ছিল। ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছি।'

'খুলে দেখলেই পারতেন।'

'দূর, কি না কি আছে! বাড়িটাই যেন কেমন। তাই না?'

শহীদ অন্যমনস্কভাবে বলল, 'হ্যাঁ।'

এমন সময় উত্তেজিত গলা শোনা গেল। মিসেস আহাদ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'স্বপনের গলা না?'

বাড়ির পুবদিক থেকে আসছে কলহের শব্দ। ওরা সেদিকেই এগোল।

বারান্দা ধরে এগিয়ে মোড় নিতেই একটি কম পাওয়ারের বাল্‌বের নিচে শহীদ দেখল স্বপন এবং মি. আকবর হোসেনকে।

ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে স্বপন। মি. আকবরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুই কোমরে দুই হাত দিয়ে রাগে কাঁপছে সে। বলছে, 'আপনি নিজেকে যত চালাকই মনে করুন, কোন লাভ হবে না তাতে।'

'মুখ সামলে কথা বলো, স্বপন। তা না হলে পস্তাবে তুমি।' বলে উঠল মি. আকবর।

স্বপন দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'আজ আপনাকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু আর কোন দিন যদি শুনি যে লিলিদিকে ব্ল্যাকমেলিং করে কুৎসিত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার চেষ্টা করেছেন তাহলে···তাহলে···।'

'স্বপন!' গর্জে উঠলেন মি. আকবর, 'আর একটি কথা বলে দেখো, খুন করে ফেলব তোমাকে...।'

স্বপন আচমকা মি. আকবরের শার্টের কলার চেপে ধরে ঝাঁকানি দিল। কিন্তু সময় মত ওদের দুজনার মধ্যে গিয়ে পড়ল শহীদ।

জোর করে ছাড়িয়ে দিল শহীদ ওদের দুজনকে। দুজনার আস্ফালন তবু কমল না। শেষ অবধি শহীদ অনুরোধ করল মি. আকবরকে স্থান ত্যাগ করাব জন্যে। মি. আকবর গজরাতে গজরাতে চলে গেল।

এতক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে ছিল মিসেস আহাদ। এবার সে কাছে এসে দাঁড়াল। স্বপনের উদ্দেশে সে বলে উঠল, 'শয়তানটার সাথে এ ব্যাপারে কথা বলতে যাওয়া উচিত হয়নি তোমার, স্বপন। ও হয়ত এবার তোমার দাদাকে গিয়ে সত্যমিথ্যে কত কি লাগাবে।'

'তা যদি কিছু লাগায় তাহলে কুকুরটাকে আমি খুন করব।' ফুঁসতে ফুঁসতে বলল স্বপন।

শহীদ ওদের আলোচনায় ইচ্ছে করেই অংশগ্রহণ করল না। ওদেরকে পিছনে রেখে বৈঠকখানায় এসে বসল ও।

একটা সিগারেট ধরিয়ে গভীর ভাবনায় মগ্ন হয়ে পড়ল শহীদ।

ডিনারের পর নিজের রুমের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আবার গভীরভাবে মগ্ন হয়ে পড়ল শহীদ। মেইন রোডে ঘরঘর ট্রাকের শব্দ। মিলিটারি ভ্যান যাতায়াত করছে। দেশের অবস্থা মোড় নিচ্ছে খারাপের দিকে।

ওরা সবাই বৈঠকখানায় বসেই ডিনার সেরেছে। শহীদ লক্ষ্য করেছে সবাই কেমন যেন থমকে গেছে এ-বাড়িতে ঢোকার চার-পাঁচ ঘণ্টা পরই। কেউ অবশ্যি উল্লেখযোগ্য কিছু বলেনি। তবে বাড়িটার পরিবেশ ভাল লাগছে না একথা বলেছে কথা প্রসঙ্গে প্রায় সব্বাই।

সবচেয়ে কম কথা বলেছে মি. আকবর হোসেন। সেটা হয়ত স্বপনের সাথে অমন একটি অপ্রীতিকর কাণ্ড ঘটে যাবার ফলে। কিন্তু শহীদ যখন মি. আকবরকে স্থান ত্যাগ করার অনুরোধ জানায় তখন সে এমন হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল স্বপনের দিকে যে শহীদ তা দেখে রীতিমত চিন্তিত হয়ে উঠেছিল। মি. আকবরকে ইতিমধ্যেই

চিনে নিয়েছে শহীদ। লোকটার টাকা থাকলে কি হবে, নিতান্ত কুৎসিত স্বভাবের লোক। স্বপনের সাথে মিসেস আহাদের সম্পর্কটাকে সে অবৈধ বলে মনে করে। ওদের দুজনার মধ্যে কোন অবৈধ সম্পর্ক আছে কিনা শহীদ তা জানে না। থাকতেও পারে। হয়ত মি. আকবর কিছু দেখে থাকবে। যার ফলে সে-ও অবৈধ ভাবে মিসেস আহাদকে ব্ল্যাকমেইল করে উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চায়। এক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার এবং জঘন্য। মিসেস আহাদকে ভোগ করতে চায় সে।

এদিকে স্বপনও রেগে আছে উন্মাদের মত। মুখ ফুটে খুন করার হুমকিও সে দিয়েছে। সেটা অবশ্যি কথার কথা।

নতুন একটি সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইয়ের কাঠিটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিতে গিয়ে চমকে উঠল শহীদ।

শহীদের সারা শরীরে কে যেন ঠাণ্ডা হিম স্পর্শ বুলিয়ে দিল।

নিশুতি রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে একটি নারী কণ্ঠের চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল শহীদ। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল শহীদ। সরু প্যাসেজ ধরে দ্রুত পায়ে বারান্দায় এসে শহীদ দেখল বারান্দার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কালো স্লিপিং গাউন পরে মি. তালুকদার। তার পায়ের সামনে চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে একটি নারীমূর্তি। দৌড়ে সামনে এসে দাঁড়াল শহীদ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ও কয়েক সেকেণ্ড মি. তালুকদারের চোখ জোড়ার দিকে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকের চোখ জোড়া যেন জ্বলছে। নিঃসাড় মেয়েটির দিকে তাকাল শহীদ। চিনতে অসুবিধে হল না মিসেস আহাদকে।

মিসেস আহাদের মাথার কাছে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন মি. তালুকদার। শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি ওকে আঘাত করেছেন?'

'মোটে-ই না।'

মি. তালুকদার শান্ত, স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, 'আমি নিচে নেমে আপনাদের সুবিধে অসুবিধে দেখতে বৈঠকখানার দিকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ ইনি দরজা খুলে আমার পায়ের সামনে লুটিয়ে পড়লেন উচ্চৈস্বরে চিৎকার করতে করতে।'

ছুটতে ছুটতে এসে পড়ল আহাদ চৌধুরী, মি. আকবর হোসেন, স্বপন এবং অন্যান্যরা।

শহীদ একে একে সকলের দিকে তাকাল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা সবাই কোথায় ছিলেন? এত দেরি করে এলেন কেন?'

'আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।' বলল মি. আকবর।

'আমরা গল্প করছিলাম সবিতার কামরায়। কিন্তু সাহস করে বেরোতে পারছিলাম না বাইরে।' বলল আহাদ চৌধুরী।

সবিতা বলল, 'বাড়িটা ভূতুড়ে বাড়ি। এমনিতেই গা ছমছম করে।

শহীদ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'মিসেস আহাদকে একটু ধরুন। বৈঠকখানায় নিয়ে চলুন ওকে।'

মিসেস আহাদকে বৈঠকখানায় নিয়ে এসে সবাইকে বাইরে বের হয়ে যেতে অনুরোধ করল আহাদ চৌধুরী। কিন্তু শহীদ বলল, 'আপনি থাকুন।'

চোখেমুখে জল ছিটাতেই জ্ঞান ফিরে এল মিসেস চৌধুরীর। আহাদ হাসিমুখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'লিলি? কি হয়েছিল? অমন চিৎকার করে উঠেছিলে কেন?'

উঠে বসল মিসেস আহাদ। তার দুই চোখে আতঙ্ক। বলল, 'আমাদের কামরার ডান দিকের বন্ধ দরজার ওপারে কি আছে দেখার জন্যে দরজা যেই খুলেছি অমনি একটা নর-কঙ্কাল দেখে চেঁচিয়ে উঠি আমি। কঙ্কালটা কামরার মাঝখানে ভাসছিল! নিজের চোখে দেখেছি আমি···না না, ভুল দেখিনি। চিৎকার করতে করতে আমাদের দরজাটা খুলে বারান্দায় বেরিয়েই দেখি কালো পোশাক পরা একজন লোক। সাথে সাথে পড়ে যাই আমি। তারপর···তারপর আমার আর কিছু মনে নেই···।'

শহীদ বলল, 'আপনার কথা বিশ্বাস করি আমি। আপনি এখানেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিন।'

শহীদ বলল, 'আপনার কথা বিশ্বাস করি আমি। আপনি এখানেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিন।'

আহাদ শহীদের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনি যা বলছিলেন তখন তা আমি বিশ্বাস করিনি। কিন্তু এখন দেখছি আপনিও ভুল দেখেননি। ব্যাপার কি, মি. কায়েস?'

শহীদ বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। মি. তালুকদারের বদ্ধমূল ধারণা যে এ-বাড়িতে অতৃপ্ত আত্মারা থাকে।'

মিসেস আহাদ বলে ওঠে, 'এ-বাড়িতে আর এক মুহূর্তও থাকব না আমি···।'

শহীদ বন্ধ দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলে ওঠে, 'অধৈর্য হবেন না, মিসেস আহাদ। অতৃপ্ত আত্মা, ভূত এসব বিশ্বাস করা উচিত না। এর শেষ না দেখে আমরা যাব না।'

আহাদ চৌধুরী সায় দেয়, বলে, 'নিশ্চয়। লোকে যা বলবে আমরা তা এমনি এমনি বিশ্বাস করব কেন!'

বাইরে সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। মিসেস আহাদ জ্ঞান ফিরে পেয়ে যা বলেছেন তা শুনে রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে পড়ল সবাই। তবে একজন ছাড়া। মি. তালুকদার মোটেই বিচলিত হলেন না। তিনি বললেন, 'এমনটি যে হবে তা আমি জানতাম।'

সবাই হাঁ করে তাকিয়ে রইল মি. তালুকদারের দিকে। শহীদ বলল, 'মি. তালুকদার, আপনি আমার সাথে একবার আসবেন কি?'

মি. তালুকদারকে নিয়ে শহীদ আহাদ চৌধুরীর কামারায় প্রবেশ করল। মি. তালুকদার জিজ্ঞেস করলেন, 'কি করতে চান আপনি?'

কামরার ডান দিকের বন্ধ দরজার দিকে পা বাড়িয়ে শহীদ বলে, 'এই দরজাটা খোলার পর মিসেস আহাদ একটি নরকঙ্কাল দেখেছেন। আমিও দেখতে চাই।'

লম্বা হাত বাড়িয়ে বৃদ্ধ মি. তালুকদার শহীদের কাঁধে একটি হাত রাখলেন। চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকাল শহীদ। মি. তালুকদার বললেন, 'সাবধান, মি. কায়েস। যা করতে যাচ্ছেন তাতে আমার কোন সমর্থন নেই। যদি কোন অঘটন ঘটে তাহলে আপনি একা দায়ী থাকবেন।'

'কেন? কি আছে দরজার ওপাশের কামরায়?'

'কি আছে জানি না। তবে শুনেছি আমার এক পূর্ব পুরুষ তার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীকে খুন করেছিলেন ওই কামরায়। তারপর থেকে ওটার ধারে-কাছে কেউ আসে না—বন্ধই পড়ে আছে।'

'ননসেন্স!'

শহীদ বন্ধ দরজাটার গায়ে ধাক্কা মারে। কিন্তু শহীদের ধাক্কায় দরজা খোলে না। হাতল ধরে ঘোরাতে গিয়েই চমকে ওঠে শহীদ।

'দরজা বন্ধ! বন্ধ করল কে?'

শহীদ ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকায়।

ছ্যাঁৎ করে ওঠে বুকের ভিতরটা। ভোজবাজীর মত অদৃশ্য হয়ে গেছেন মি. তালুকদার। কামরার কোথাও নেই তিনি।

পাঁচ

ঘণ্টাখানেক পর নিজের কামরায় ফিরে এল শহীদ। দরজা খুলে রেখেই বেরিয়ে গিয়েছিল ও।

কামরায় ঢুকেই থমকে দাঁড়ায় শহীদ। লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে বিছানার তোষক, চাদর। টেবিলের ড্রয়ারগুলো টেনে বের করা। স্যুটকেস দুটো স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

কেউ ঢুকেছিল কামরায়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখতে দেখতে শহীদের চোখে চকচকে একটা ধাতব পদার্থ ধরা পড়ল। বিছানার উপর পড়ে রয়েছে জিনিসটা। এগিয়ে গিয়ে হাতে তুলে নিয়ে দেখল জিনিসটা একটি কানের দুল।

এ বাড়িতে তিনজন মাত্র মেয়ে আছে। মিসেস আহাদ এবং মিস সবিতার কথা বাদ দিলে থাকে মাত্র একজন। এ বাড়ির চাকরানী-কাম-রাঁধুনী পটলার মা।

পিতলের দুল। নিশ্চয়ই পটলার মা'র।

দুলটা হাতে নিয়ে দরজায় তালা মেরে বাইরে বেরিয়ে এল শহীদ। পটলার মা

থাকে বাড়ির পিছন দিককার সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে।

প্রায় অন্ধকার প্যাসেজ ধরে বাড়ির পিছন দিকে চলে এল শহীদ। পটলার মা'র কামরার সামনে এসে দাঁড়াল ও।

কিন্তু দরজা বাইরে থেকে খিল দেয়া।

এত রাতে কোথায় গেছে পটলার মা? ভাবতে ভাবতে দূরের শব্দ কানে শুনতে পায় শহীদ। ডানদিক থেকে মাটি কোপাবার শব্দ হচ্ছে যেন।

দ্রুত পা বাড়িয়ে এগিয়ে চলে শহীদ। কিন্তু শব্দের উৎসস্থল আবিষ্কার করার আগেই থেমে যায় শব্দ। শহীদ পিছন দিককার বারান্দায় এসে অন্ধকারে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বুম্‌ম্‌ বুম্‌ম্‌ দুটো বোমা ফাটল ঢাকায়।

বারান্দার নিচে থেকে শুরু বিরাট বাগান। অন্ধকারে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত। শহীদ কান পেতে থাকে। কিন্তু বাগানে কারোই নড়াচড়ার শব্দ নেই।

'হুজুর!'

বিদ্যুৎ বেগে ঘুরে দাঁড়ায় শহীদ। ঠিক পিছনেই সুরত আলীর কণ্ঠস্বর শুনে।

'সুরত আলী? এখানে কি করছ তুমি?' শহীদ জিজ্ঞেস করে কঠিন গলায়।

'কিছু করছি না, হুজুর।'

সুরত আলী কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়ায়, 'আপনাকে এদিকে আসতে দেখে পিছন পিছন এলাম।'

'বলো কি! কারা মাটি খোঁড়ে।'

শহীদ তাকিয়ে রইল প্রকাণ্ড চেহারার লোকটার দিকে। বাগানে মাটি কোপাবার শব্দ হচ্ছিল। শুনেছ তুমি?

'রোজই শুনি, হুজুর।'

'বলো কি! কারা মাটি খোঁড়ে।'

সুরত আলী চাপা গলায় বলে, 'জানি না, হুজুর।'

'মি. তালুকদার কথাটা জানেন?'

সুরত আলী বলে, 'জানেন বৈকি। তিনি বলেন এ বাড়িতে অনেক কিছু আছে। আমরা যেন মাথা না ঘামাই।'

শহীদ গম্ভীর ভাবে শুধু বলে, 'হুঁ। আচ্ছা, পটলার মা'র কামরা বাইরে থেকে বন্ধ কেন? এত রাতে কোথায় গেছে সে?'

সুরত আলী বলে, 'পটলার মা তো হুজুর ভাইপো'র বাড়ি বেড়াতে গেছে। ফিরবে কাল সকালে।'

শহীদ আর কিছু বলে না।

রাতটা নিরুপদ্রবেই কেটে গেল। সকালে স্নান সেরে বৈঠকখানায় নাস্তা সারে ওরা সবাই। রাতে মিসেস আহাদ ও মিস সবিতা এক কামরায় শুয়েছিল। আহাদ চৌধুরী নিজের কামরায় রাত কাটিয়েছেন একাই।

সারাটা দিন কেটে গেল উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ব্যতিরেকেই। দেশের অবস্থা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে। সবার মধ্যেই একটা চাপা উত্তেজনা। কাজে মন নেই। সন্ধ্যার পর বৈঠকখানায় মিলিত হল শহীদ ক্যামেরাম্যানের সাথে। ক্যামেরাম্যান ইকবালের সাক্ষাৎকার নিতে চাইলে সানন্দে সম্মতি দিল সে।

সাক্ষাৎকার নেয়া শেষ হতেই ট্রে হাতে করে বৈঠকখানায় ঢুকল সুরত আলী। শহীদ তাকে জিজ্ঞেস করল, 'পটলার মা আজ সকালে ফিরেছে, সুরত আলী?'

'জ্বী, হুজুর।'

'কই, সারাদিন তো দেখলাম না এদিকে কোথাও?'

'মেয়েছেলেটা বড় লজ্জাটে, হুজুর। পুরুষদের সামনে বের হতে চায় না। রান্নাঘরেই ছিল সারাদিন।'

শহীদ প্রসঙ্গটা ত্যাগ করে। ইকবাল চায়ে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কোন পত্রিকার রিপোর্টার মি. কায়েস?'

শহীদ বলে, 'সাপ্তাহিক হালচালের।'

দারুণ কাটতি পত্রিকাটির। মন্তব্য করে ইকবাল।

এমন সময় বৈঠকখানায় প্রবেশ করল আহাদ। শহীদ জিজ্ঞেস করে, 'মিসেস আহাদ এখন কেমন, আহাদ সাহেব?'

'ভয় কাটিয়ে উঠতে পারছে না এখনও।' চিন্তিতভাবে বলে আহাদ।

ইকবাল জিজ্ঞেস করে, 'এখনও কি তিনি নরকঙ্কালের ব্যাপারটা সত্যি দেখেছেন বলে মনে করছেন?'

শহীদ বলে ওঠে, 'মনে করার কিছু নেই। মিসেস আহাদ সত্যিই নরকঙ্কাল দেখেছেন। আমার বিশ্বাস কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে তাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিল।'

ইকবাল বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি বাড়িটাকে মোটেই ভাল লাগছে না আমার।'

আহাদ বলে উঠল, 'এসব কথা ছাড়ো, ইকবাল। আমরা এখানে এসেছি ছবি তুলতে...।'

আহাদ চৌধুরীর কথা শেষ হল না। রক্ত হিম করা একটা আর্তনাদ রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান করে দিল।

লাফ মেরে বৈঠকখানা থেকে বাইরে বেরিয়ে এল শহীদ।

শহীদের পিছু পিছু ইকবাল এবং আহাদও বেরিয়ে এল। বারান্দার দুটো পাশাপাশি কামরার দরজা খুলে গেল পরমুহূর্তে। স্বপন এবং মিস সবিতা বেরিয়ে এল। চোখেমুখে উত্তেজনার চিহ্ন সকলের।

শহীদ বলে উঠল, 'চিৎকারটা উপরতলা থেকে এসেছে।'

সিঁড়ির দিকে ছুটল শহীদ। ওকে অনুসরণ করল সবাই।

ছয়

উপরতলায় উঠে শহীদ দেখল হাঁ-হাঁ করছে মি. আকবর হোসেনের কামরার দরজা। ভিতরটা অন্ধকার।

খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জোর গলায় ডাকল শহীদ, 'মি. আকবর।'

কেউ সাড়া দিল না কামরার ভিতর থেকে।

অন্ধকার কামরার ভিতর প্রবেশ করল শহীদ। হাতড়ে হাতড়ে সুইচ খুঁজে বাতি জ্বালল।

আলোকিত কামরায় মি. আকবর হোসেনকে দেখা গেল না। পরস্পরের দিকে তাকাতে তাকাতে কামরায় প্রবেশ করল অন্যান্যরা। শহীদ বাথরূমের খোলা দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

খোলা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল শহীদ। পরমুহূর্তে ঘুরে দাঁড়াল ও।

দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল মিস সবিতা। শহীদ পথ আগলে ধরল, 'যাবেন না। ওদিকে যাবেন না আপনি।'

শহীদের মুখটা অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখাচ্ছে। এক মুহূর্তেই ঘেমে উঠেছে ও। ইতিমধ্যে বাথরূমের খোলা দরজার সামনে পুরুষেরা ভিড় করে এগিয়ে এসেছে। পথ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াল শহীদ।

'বাথটাবে ওটা কার কঙ্কাল!' প্রায় চিৎকার করে উঠল আহাদ চৌধুরী।

বাথরূমের ভিতর ঢুকে পড়ল ক্যামেরাম্যান ইকবাল। সে কাঁপা গলায় বলে উঠল, 'এ কিসের গন্ধ! এযে অ্যাসিড! আকবর সাহেবের বাথটাবে অ্যাসিড! তবে কি কঙ্কালটা…।'

শহীদের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে সবাই চমকে উঠে তাকাল তার দিকে। শহীদ বলে উঠল, 'হ্যাঁ। ওটা মি. আকবর হোসেনেরই কঙ্কাল। সোনা বাঁধানো দাঁতটা দেখেই চেনা যাচ্ছে। অ্যাসিডে পুড়ে গিয়ে ওই কঙ্কালসার অবস্থা হয়েছে ভদ্রলোকের।

বাথরূমের দরজার কাছ থেকে নিঃশব্দে সরে এল সবাই। কয়েকটি মুহূর্ত চরম অস্বস্তির মধ্যে কাটল। কারও মুখে কোন কথা নেই। সবাই তাকিয়ে আছে শহীদের দিকে। নীরবতা ভাঙল আহাদ চৌধুরী, 'একি অবিশ্বাস্য ঘটনা। কে ওকে খুন করল?'

ইকবাল জোর দিয়ে বলল, 'খুনী নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যেই কেউ হবে।'

শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'এই অ্যাসিড কোথা থেকে আসতে পারে তা কেউ ধারণা করতে পারেন?'

জবাব দিল না কেউ।

শহীদ সকলকে নিয়ে কামরার বাইরে বেরিয়ে এসে দরজায় তালা লাগিয়ে দিতে

দিতে বলল, 'তালা কেউ খুলবেন না। আমি পুলিসে খবর দিতে যাচ্ছি।'

সুরত আলী বলল, 'ফোন করবেন তো, আসুন হুজুর আমার সাথে।'

মি. তালুকদারের বসবার কামরায় ভদ্রলোককে দেখা গেল না। শহীদ জিজ্ঞেস করতে সুরত আলী বলল, 'উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

রিসিভার তুলে ডায়াল করতে গিয়ে শহীদ দেখল ফোন খারাপ। কেউ হয়ত তার কেটে দিয়েছে।

শহীদ রিসিভার নামিয়ে রেখে সুরত আলীর দিকে তাকাল। বলল, 'এ বাড়ি সম্পর্কে কি জানো তুমি, সুরত আলী? সত্যিই কি অতৃপ্ত অশরীরী আত্মারা…।'

বাধা দিয়ে সুরত আলী বলল, 'কিছুই বুঝতে পারি না, হুজুর। মাত্র পাঁচ ছয় দিন আগে এখানে এসেছি। তালুকদার সাহেবের মেয়ে আমাকে চাকরি দিয়ে পাঠিয়েছেন এখানে। আমি আসার দু'দিন পর তালুকদার সাহেব বিদেশ থেকে পৌঁছেছেন।'

শহীদ বলল, 'কিন্তু তার আগে নিশ্চয়ই চাকরবাকর ছিল। তারা কোথায় গেল?'

'ছিল, হুজুর। কিন্তু তালুকদার সাহেব বিদেশে যাবার আগে সবাইকে বিদায় করে দিয়ে গিয়েছিলেন।'

শহীদ সুরত আলীকে সাথে নিয়ে মি. তালুকদারের শোবার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর ভদ্রলোকের ঘুম ভাঙল।

দরজা খুলে বিরক্ত কণ্ঠে তিনি সুরত আলীর উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, 'এ কিরকম ব্যবহার শুরু করেছ, সুরত আলী? বলেছি না, যত বড় বিপদই ঘটুক, ঘুম থেকে ডেকে তুলবে না আমাকে।'

শহীদ কোন ভূমিকা না করে যা ঘটেছে তা বলে গেল শান্ত ভাবে।

মি. তালুকদারের মধ্যে বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষ করল না শহীদ। বড় আজব মানুষ। সব শুনে তিক্ত কণ্ঠে শুধু বললেন, 'বলিনি আমি? সাবধান করে দিইনি আপনাদেরকে? দেখলেন তো, কী ভয়ঙ্কর একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ছাড়লেন আপনারা!'

শহীদ বুঝতে পারল এই আধা-পাগলা বুড়োর সাথে কথা বলা বৃথা। ও শুধু বলল, 'আপনি কিন্তু ভুলেও ভাববেন না যে আমরা অতৃপ্ত আত্মা বা ভূত প্রেতের কথা বিশ্বাস করব। পুলিস আসুক, তখন দেখা যাবে অতৃপ্ত আত্মার বদলে অন্য কেউ বের হয় কিনা!'

কথাগুলো বলে শহীদ দাঁড়াল না।

নিচে নেমে এসে সকলকে ডেকে জড়ো করল ও বৈঠকখানায়।

স্বপন বলল, 'আমার কামরায় আমি একা ছিলাম। কিন্তু কামরায় যে ছিলাম তা কেউ দেখেনি। তাই বলে সন্দেহের মধ্যে নিশ্চয়ই পড়ি না আমি।'

শহীদ ভারি গলায় বলে উঠল, 'আপনারা সবাই সন্দেহের আওতায় পড়েন।

সত্যি কথা বলতে কি, মি. আকবর হোসেনকে আপনারা কেউই পছন্দ করতেন না। কেউ কেউ প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন তাকে।'

তিক্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল আহাদ চৌধুরী, 'আমি জানতাম মি. কায়েস আপনি একজন সাংবাদিক। এখন মনে হচ্ছে শার্লক হোমস হবার চেষ্টা চালাচ্ছেন!'

ইকবাল বলে উঠল, 'আচ্ছা, দেখা যাক ঘটনাটা ঘটার আগে আমরা কে কোথায় ছিলাম।'

শহীদ বলল, 'বেশ। সুরত আলী আপনি এবং আমি ছিলাম বৈঠকখানায়। অনেকক্ষণ আগে থেকেই আমরা তিনজন ছিলাম এখানে।'

বিরক্ত কণ্ঠে আহাদ বলে উঠল, 'আমিও ছিলাম আপনাদের সঙ্গে। ভুলে গেলেন এরিমধ্যে?'

শহীদ বলল, 'না, ভুলিনি। কিন্তু চিৎকারটা শোনার দু'এক মুহূর্ত আগে মাত্র এখানে এসে পৌঁছেছিলেন আপনি। জানতে পারি কি কোথা থেকে এসেছিলেন?'

'অবশ্যই আকবরকে খুন করে!'

রেগে উঠল আহাদ। বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে গেল সে। ইকবাল বলে উঠল, 'এসব আলোচনায় লাভ কি? নিশ্চয়ই আকবর সাহেব খুন হয়েছেন আমরা চিৎকার শোনার অনেক আগে। চিৎকারটা করেছে খুনী, আমাদেরকে বোকা বানানর জন্যে।'

শহীদ বলল, 'ঠিক বলেছেন। সুরত আলী, আমার সাথে এসো তো।'

সুরত আলীকে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল শহীদ। বলল, 'তুমি গাড়ি চালাতে জানো নিশ্চয়?'

'মি. তালুকদারের গাড়ি তো আমিই চালাই, হুজুর।'

বাইরে প্রবল বাতাস। ঝড় উঠবে মনে হচ্ছে। দূরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

শহীদ বলল, 'আমাদের কারও গাড়ি নিয়ে সোজা থানায় চলে যাও তুমি।'

'বড় দুর্যোগের রাত, থানা থেকে কি আসবে কেউ? রাস্তার মোড়ে মোড়ে সংগ্রাম কমিটির লোকেরা কিন্তু ঠিক আছে, হুজুর, আমি যাচ্ছি...।'

শহীদ বারান্দা থেকে মিসেস আহাদের কামরায় এল সোজা। অসুস্থ বলে সে কামরা থেকে বের হয়নি। চিৎকারটা সে-ও শুনেছে। কিন্তু এখন অবধি কেউ তাকে কারণটা জানায়নি। শহীদও জানাল না।

প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলল, 'মি. আকবর ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠেছিলেন। অন্য কোন ব্যাপার নয়। আমার কি ধারণা জানেন? আপনাকে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ভয় দেখাতে চেয়েছিল।'

'নিশ্চয়ই।'বলল মিসেস আহাদ, 'কঙ্কালটা কালো রঙে রঙ করা ছিল। শূটিঙের জন্যে ওই ধরনের কঙ্কাল আনা হয়েছে গাড়ি করে।'

শহীদ বলল, 'তাই নাকি!'

মিসেস আহাদ মাথার নিচে আর একটি বালিশ দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ। কিন্তু কে

আমাকে অমন করে ভয় দেখাতে চাইবে? কেন?'

শহীদ বলল, 'আপনি বন্ধ দরজা খুলেছিলেন। সে সময় হয়ত ওই কামরায় কেউ ছিল। আমি খোঁজ করে দেখব কে ছিল তখন ওই কামরায়। কি করছিল সে ওখানে।'

শহীদ বেরিয়ে গেল মিসেস আহাদের কামরা থেকে।

সাত

উপর তলায় বিশেষ কেউ নেই। সুরত আলী মি. তালুকদারের নির্দেশে এক কাপ কফি দিয়ে গেছে বেশ খানিক আগে তাঁর বসার ঘরে।

মিটমিট করে জ্বলছে টেবিলের উপর কেরোসিন ল্যাম্পটা। আলোর চেয়ে অন্ধকারই যেন সৃষ্টি করছে ল্যাম্পটা।

খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে বসে আছেন মি. তালুকদার। উৎকণ্ঠিত দেখাচ্ছে তাঁকে।

এমন সময় দোর-গোড়ায় একটি ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল। কালো একটি চাদরে গা মুড়ে এসেছে ছায়ামূর্তি। দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'কে ওখানে বসে?'

'আমি। ভিতরে আসুন।'

টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল ছায়ামূর্তি। কালো বিড়ালটা টেবিলের মাঝখানে, বাজপাখির ডানার নিচে বসে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ছায়ামূর্তির দিকে।

মি. তালুকদার রাগত অথচ নিচু গলায় বলে উঠলেন, 'বোকামির চরম করেছেন! অতিরিক্ত চমক দেখাতে গিয়ে সর্বনাশ করে ফেলেছেন আপনি! খানিক পরই পুলিস আসবে বাড়িতে!'

ছায়ামূর্তির গলায় ব্যঙ্গ, 'ভয়ের কিছু নেই।'

'নেই। বোকার মত কথা বলবেন না! আমি আপনার সাহায্য চেয়েছিলাম কোন ব্যাপারে? ভয় দেখিয়ে সব লোককে এ-বাড়ি থেকে ভাগাবার প্ল্যান ছিল আমার। তার বদলে আপনি পুলিস আনার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। যেটা আমি মোটেই চাই না।'

'তাতে কি?'

ছায়ামূর্তি বলল, 'আমাকে কেউ সন্দেহ করবে না, বন্ধু।'

ছায়ামূর্তি ঝট করে কালো চাদরের ভিতর থেকে পিস্তল ধরা ডান হাতটা বের করল। পিস্তলের নল মি. তালুকদারের বুক বরাবর ধরে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'তোমার লাশ যখন দেখবে তখন সবাই ভাববে শেষ পর্যন্ত তুমি আত্মহত্যা করেছ। যুক্তিসঙ্গতই ভাববে সেটা সবাই।'

'না!'

করুণ আর্তি ফুটে উঠল মি. তালুকদারের কণ্ঠে, 'আমাকে মারবেন না। যা

চাইবেন আপনি সব দেব…।'

'এই আমার জবাব!'

সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলের ট্রিগার টিপে ধরল ছায়ামূর্তি।

বুকে গুলি খেয়ে টুঁ-শব্দটি করার শক্তিও রইল না মি. তালুকদারের। ঢলে পড়লেন তিনি চির অন্ধকারের কোলে।

শহীদ মিসেস আহাদের কামরা থেকে বেরিয়েই দেখতে পায় সুরত আলী মোড় নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল একটা প্যাসেজে। হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শহীদ। বারান্দায়। সুরত আলী এরিমধ্যে থানায় গেল এবং ফিরে এল?

অসম্ভব! গ্যারেজের দিকে পা বাড়াল শহীদ। গাড়ি নিয়ে সত্যিই সুরত আলী বাইরে গিয়েছিল কিনা দেখা দরকার।

উঠানে নেমে গ্যারেজের দিকে এগিয়ে চলল শহীদ। গ্যারেজের বড় টিনের দরজাটা খোলাই দেখা গেল। ভিতরে ঢুকে দেশলাইয়ের কাঠি থেকে সুইচবোর্ডটা দেখে নিল শহীদ।

গেটের পাশেই সুইচবোর্ড।

সুইচ অন করে আলো জ্বেলে প্রথম গাড়িটার সামনের বনেটে হাত দিয়ে শহীদ দেখল ইঞ্জিন ঠাণ্ডা বরফ।

দ্বিতীয় গাড়ির সামনের বনেটে হাত রেখেছে শহীদ। এমন সময় কোথাও কিছু নেই। নিভে গেল বাতি।

গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেল গ্যারেজ। চমকে উঠে গ্যারেজের গেটের দিকে তাকাল শহীদ। গেটের সামনে আবছাভাবে কে যেন নড়ছে।

'লুকোবার চেষ্টা করে লাভ নেই কায়েস। আমার হাতে ইনফ্রা রেড ল্যাম্প এবং চোখে স্পেশাল চশমা আছে। তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ না কিন্তু তোমাকে আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।'

ইচ্ছে করেই কণ্ঠস্বর বিকৃত করে নিয়েছে ছায়ামূর্তি—বুঝতে পারল শহীদ।

আবছা অন্ধকারে ছায়ামূর্তিকে অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিল শহীদ। ছায়ামূর্তির কথা শেষ হতেই বিদ্যুৎবেগে লাফিয়ে পড়ল সে তার ঘাড়ে।

সশব্দে পড়ে গেল শহীদ ছায়ামূর্তিকে নিয়ে। কিন্তু দ্রুত উঠে বসতে গিয়ে প্রচণ্ড এক ঘুসি খেল চোয়ালে। ছিটকে পড়ল শহীদ দেয়ালের গায়ে। সেখান থেকে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই সবুট একটা লাথি এসে লাগল ওর পেটে।

পেটে হাত দিয়ে রেখেছিল বলে লাথিটা মারাত্মকভাবে কাবু করতে পারল না শহীদকে। দ্বিতীয় লাথির জন্যে তৈরি হয়ে গেল ও।

এল দ্বিতীয় লাথি।

সজোরে জড়িয়ে ধরল শহীদ ছায়ামূর্তির পা'টা। তাল সামলাতে না পেরে পড়ে

গেল ছায়ামূর্তি। শহীদ বুঝতে পারল পড়ে গিয়ে উপুড় হয়ে গেছে লোকটা।

লোকটার পা ছেড়ে দিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করল শহীদ। কিন্তু পা'টা ছেড়ে দিতেই পা ছুঁড়ে মারল ছায়ামূর্তি শহীদকে লক্ষ্য করে শুয়ে শুয়েই।

শহীদ গড়িয়ে সরে গেল খানিকটা। দ্রুত শব্দ কানে ঢুকল। উঠে বসল শহীদ। পেটটা ব্যথা করছে তীব্রভাবে।

টিনের গেটে শব্দ হল। ছায়ামূর্তি পালিয়ে যাচ্ছে।

উঠে দাঁড়িয়ে পেট চেপে ধরে ব্যথা সহ্য করার চেষ্টা করল শহীদ।

ছায়ামূর্তি পালিয়ে গেছে। গ্যারেজের বাতি জ্বালল শহীদ এক মুহূর্ত পরই। মেঝেতে পড়ে রয়েছে একটি টর্চ এবং একটি চশমা। চশমার একটি কাঁচ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেছে।

গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে উঠান পেরিয়ে বারান্দায় উঠে এল শহীদ। সুরত আলীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার! কোথায় পাওয়া যাবে তাকে?

প্যাসেজ ধরে যেতে দেখেছিল শহীদ সুরত আলীকে। সম্ভবত হলরুম হয়ে উপর তলায় উঠে গেছে সে।

সিঁড়ির দিকে পা বাড়ল শহীদ।

উপর তলায় উঠেই শহীদ দেখে ফেলল সুরত আলীকে। সুরত আলী মি. তালুকদারের কামরার কী-হোলে চাবি ঢুকিয়ে তালা খোলার চেষ্টা করছে।

কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল শহীদ, 'এখানে কেন তুমি, সুরত আলী?'

'মি. তালুকদারের কামরার ভিতর কেমন যেন একটা শব্দ হয়েছে হুজুর। তাই নিচে থেকে উঠে এসে তালা খুলতে যাচ্ছিলাম।' সুরত আলী কী-হোল থেকে চাবি বের করে নিয়ে শহীদের দিকে ফিরে কথাগুলো বলল।

'এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে! পুলিসে খবর দিয়েছ?'

সুরত আলী এতটুকু ইতস্তত না করেই বলে উঠল, 'জ্বী, হুজুর। পুলিস এসে পৌঁছবে খানিক পরই।'

শহীদ কঠিন গলায় বলে উঠল, 'মিথ্যুক কোথাকার! চালাকি করার জায়গা পাওনি? তোমার আসল পরিচয় কি বলো! নিশ্চয়ই তুমি এ-বাড়ির চাকর নও।'

সুরত আলীর চোখ জোড়া যেন সতর্ক হয়ে উঠল। পরমুহূর্তে হাসল সে। বলল, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন, মি. কায়েস। আমি চাকর নই। আমি একজন ডিটেকটিভের হয়ে কাজ করছি।'

'ডিটেকটিভ?'

শহীদ আকাশ থেকে পড়ল। বলল, 'তোমার...আপনার কথার প্রমাণ কি?'

সুরত আলী বলল, 'বিখ্যাত ডিটেকটিভ শহীদ খানের নাম শুনেছেন নিশ্চয়? আমি সেই শহীদ খানের বন্ধু।'

অবাক হয়ে গেল শহীদ।

'শহীদ খানের বন্ধু।'

সুরত আলী তার বিরাট গোঁফ, লম্বা জুলফি এবং খোঁচা খোঁচা দাড়ি দেখিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। এগুলো নকল। ছদ্মবেশ নিয়ে আমি আছি এখানে।

'কারণ?'

প্রচণ্ড রবে হেসে ওঠার প্রবল স্পৃহাটাকে কোন রকমে দমন করে প্রশ্ন করে শহীদ। আশ্চর্য, এতক্ষণ চিনতেই পারেনি শহীদ কুয়াশাকে। হঠাৎ চিনে ফেলল। কুয়াশার ছদ্মবেশ সত্যিই নিখুঁত। তার নিজের ছদ্মবেশেও কোন খুঁত নেই। তার প্রমাণ কুয়াশাও শহীদকে চিনতে পারেনি এখনও।

কুয়াশা বলল, 'গোড়া থেকে বললে কারণটা বুঝতে পারবেন। শহীদ খানের বাড়িতে মি. তালুকদারের মেয়ে হাজির হয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। তার সন্দেহ হয়েছে মি. তালুকদার মারা গেছেন, মানে নিহত হয়েছেন। মাসখানেক আগে মি. তালুকদার বিদেশে চলে যান। কিন্তু মেয়েকে তিনি বিদেশ-যাত্রা সম্পর্কে কিছুই বলেন না। মেয়েকে এত ভালবাসেন মি. তালুকদার, অথচ মেয়েকে না জানিয়ে বিদেশ ভ্রমণে যেতে পারেন তা অবিশ্বাস্য। তার মেয়ে থাকে হোস্টেলে। বাবা যে বিদেশে গেছেন তা সে জানতই না। হঠাৎ বিদেশ থেকে তার বাবার চিঠি আসে। চিঠিটা ইংরেজিতে টাইপ করা। চিঠিতে মি. তালুকদার কোন কারণ দেখাননি। কেন তিনি তার মেয়েকে না জানিয়ে বিদেশ ভ্রমণে গেছেন। চিঠিতে শুধু লেখা ছিল যে মি. তালুকদার অমুক তারিখে দেশে ফিরবেন এবং বাড়ির দেখাশোনা এবং রান্নাবান্না করার জন্যে চাকর-চাকরানী দরকার। চাকর-চাকরানীর ব্যবস্থা যেন মেয়ে করে রাখে। চিঠি পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে মি. তালুকদারের মেয়ে। প্রথমত, তার বাবা তাকে কখনও ইংরেজিতে চিঠি লেখেন না। দ্বিতীয়ত, তিনি টাইপ করতে জানেন না। তৃতীয়ত, খবর না দিয়ে কেন বিদেশে গেছেন এসম্পর্কে কোন কথাই চিঠিতে নেই। যাই হোক, মেয়েটি পরামর্শের জন্যে শহীদ খানের কাছে আসে। শহীদ বাসায় ছিল না বলে কামালের অনুরোধে আমি আসল ব্যাপার কি জানার জন্যে এখানে এসেছি।'

শহীদ প্রশ্ন করল, 'ইতিমধ্যে কতটুকু কি জানতে পেরেছেন?'

কুয়াশা বলল, 'মি. তালুকদারকে খুন করা হয়েছে প্রায় মাস দেড়েক আগে। গতরাতে কামাল এবং স্যানন ডি. কস্টা তার লাশ আবিষ্কার করেছে এ-বাড়ির পিছনের বাগান থেকে।'

শহীদ চমকে উঠে বলে, 'তাহলে আমরা যাকে মি. তালুকদার হিসেবে দেখছি বর্তমানে ইনি কে?'

'ইনি প্রকৃত মি. তালুকদারের সেক্রেটারি কাসেম বাট।'

কুয়াশা বলল, 'আমার ধারণা কাসেম বাটই খুন করেছে মি. তালুকদারকে। খুন

করে ফেলে পুরানো চাকরবাকরদেরকে বলে যে মি. তালুকদার বিদেশে চলে গেছেন। সেই সাথে তাদেরকে বিদায় করে দেয়। তারপর স্বয়ং বিদেশে গিয়ে প্লাস্টিক সার্জারির বদৌলতে নিজের চেহারা পাল্টে মি. তালুকদারের রূপ নিয়ে ফিরে এসেছে আবার। ফেরার আগে মি. তালুকদারের মেয়েকে চিঠি পাঠিয়েছিল।'

শহীদ বলল, 'আপনার সহযোগিতার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার কাছে আমার সত্য পরিচয় দিতে দ্বিধা নেই। আমিও এখানে ছদ্মবেশ নিয়ে এসেছি। ওই যে প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খানের নাম বলেছিলেন? আমিই সেই শহীদ খান।

কথাগুলো বলে কুয়াশার বিস্মিত চোখের সামনে শহীদ ওর নকল ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি খুলে ফেলে আবার তা যথাস্থানে লাগিয়ে রাখে।

এমন সময় অপর একটি কণ্ঠস্বর শোনা যায় বারান্দায়, 'ওয়ান্ডারফুল! কেহ কারে নাহি চেনে সমানে সমান?'

মোটা একটি থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে থুরথুরে এক বৃদ্ধ। কুয়াশা এবং শহীদের সামনে এসে দাঁড়ায় সে। বলে, 'আর আমি হচ্ছি বিখ্যাত শখের গোয়েন্দা শহীদ খানের সুযোগ্য সহকারী। আমার নাম শ্রীযুক্ত কামাল আহমেদ।'

শহীদ হেসে ফেলে। কুয়াশা জিজ্ঞেস করে, 'কিন্তু তুমি এখানে কেন, শহীদ?'

সংক্ষেপে বলল শহীদ ওর এখানে আসার কারণ। সব শুনে কামাল বলল, 'তার মানে, ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কাসেম বাটের শত্রু হচ্ছে কুদ্দুস সাহেব, যে তোমাকে এখানে আসতে বলেছিল। কুদ্দুস নিজে চোরাই সোনার গহনা এবং হিরের কারবারী, কাসেম বাটও নিশ্চয়ই তাই। কাসেম বাটকে ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল সে।'

কুয়াশা বলে, 'কাসেম বাট অনেক দিন থেকেই চোরাই হিরে এবং গহনা কেনাবেচার ব্যবসা করছে এখানে থেকে।'

শহীদ বলে, 'হ্যাঁ। এবং মি. তালুকদার হয়ত জেনে ফেলেন ব্যাপারটা। ফলে কাসেম বাট মি. তালুকদারকে খুন করে নিজেই তালুকদার সেজে বসে। কিন্তু কাসেম বাট মি. আকবর হোসেনকে খুন করল কেন? দাঁড়াও, বুঝতে পেরেছি আমি···।'

'কেন খুন করেছে?' জিজ্ঞেস করে কামাল।

শহীদ বলে, 'কাসেম বাট জানত না আমরা ছবি তোলার জন্যে এখানে আসছি। কারণ মি. আকবর হোসেন তার সাথে কোন কথাবার্তা বলেনি। তার কথা হয়েছিল স্বয়ং প্রকৃত মি. তালুকদারের সাথে। সুতরাং আমরা আসছি তা কাসেম বাটের না জানারই কথা। তাই আমাদেরকে বাড়ির ভিতর ঢুকতে দিতে চায়নি সে। কিন্তু আকবর হোসেন কথা বলেছিল প্রকৃত মি. তালুকদারের সাথে। তাই সে বুঝতে পারে কোথাও বড় ধরনের একটা গোলমাল আছে। গোলমালটা বুঝতে পেরেই সে কাসেম বাটকে ব্ল্যাকমেইল করতে শুরু করে।'

কুয়াশা বলে ওঠে. 'চমৎকার। তোমার ব্যাখ্যা যুক্তি সঙ্গত।'

'যা ভাবছি ঠিক তাই।'

শহীদ বলে আবার, 'মি. আকবর হোসেন যে চরিত্রের লোক তাতে বড় অঙ্কের লাভ দেখে অপরাধ করে বসা তার পক্ষে খুবই সম্ভব। ওরা দু'জন, মি. আকবর এবং কাসেম বাট, একা ছিল আমরা যখন আহাদ চৌধুরীর সহকারীর ফোন ধরতে বাড়ির ভিতর ঢুকেছিলাম। ফোন সেরে যখন ফিরে এলাম তখন দেখা গেল সব গোলমাল মিটে গেছে। অথচ অত সহজ ছিল না গোলমালটা।'

কুয়াশা বলল, মোটিভ পাচ্ছি দুটো খুনেরই। কাসেম বাট মি. তালুকদারকে খুন করেছে তিনি ওর অবৈধ ব্যবসার কথা জেনে ফেলেছিলেন বলে এবং মি. আকবরকে খুন করেছে ব্ল্যাকমেইলিং থেকে রেহাই পাবার জন্যে। কামাল, তুমি বাড়ির বাইরে থাকো। কাসেম বাট ইতিমধ্যেই হয়ত সন্দেহ করেছে কিছু। পালাবার চেষ্টা করতে পারে শয়তানটা। শহীদ, এসো।

কুয়াশা নকল মি. তালুকদার ওরফে কাসেম বাটের কামরার দরজার তালা খুলে ভিতরে প্রবেশ করল।

কেরোসিন ল্যাম্পের আলোয় কামরার ভিতরকার সব জিনিস ভাল দেখা যাচ্ছে না। কুয়াশা সুইচ অন করে বৈদ্যুতিক আলোয় ভরে দিল গোটা কামরাটা।

চেয়ারের উপর বসে আছে কাসেম বাট। নুয়ে পড়েছে মাথাটা বুকের কাছে। বুকের বাঁ দিকে ছোট একটা ছিদ্র। রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে ইতিমধ্যে।

শহীদ কাসেম বাটের গায়ে হাত দিয়ে বলে উঠল, 'খুব বেশিক্ষণ আগে মরেনি।'

'আত্মহত্যা, শহীদ?'

কুয়াশার প্রশ্নের উত্তরে শহীদ বলল, 'না। আত্মহত্যা নয়। প্রকৃত খুনীর সাথে খানিক আগে গ্যারেজে আমার ধস্তাধস্তি হয়ে গেছে। চোখে মুখে সদ্যক্ষতের চিহ্ন থাকবেই। কাসেম বাটের মুখে তেমন কোন দাগ নেই। কুয়াশা?'

'বলো।'

শহীদ বলল, 'তুমি দেখো এখানে আর কি পাও। একটু পরই ফিরে আসছি আমি।' বলতে বলতে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল শহীদ কাসেম বাটের কামরা থেকে।

আট

বিদ্যুৎ চমকের মত একটা সন্দেহ খেলে গেছে শহীদের মনে। ভয়ঙ্কর সন্দেহ। কল্পনাতীত।

কঙ্কালটা আর একবার দেখতে চায় শহীদ। মি. আকবর হোসেনের কঙ্কাল।

মি. আকবর হোসেনের কামরার দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খোলে শহীদ।

আলোকিত কামরা। আলো জ্বালাই ছিল। টেবিলের উপর থেকে একটা টর্চ

তুলে নিয়ে বাথরুমের দিকে এগিয়ে যায় শহীদ।

দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই শহীদ বাথটাবটা দেখতে পায়।

বাথটাব আছে। কিন্তু বাথটাবে কঙ্কালটা নেই।

মুচকি হাসি ফোটে শহীদের ঠোঁটে। মি. আকবর হোসেনের কঙ্কাল নেই। বন্ধ কামরার ভিতর থেকে কোথায় যেতে পারে কঙ্কালটা?

সন্দেহটা আগেই জেগেছিল শহীদের মনে। খুব একটা আশ্চর্য হয়নি ও। কিন্তু কঙ্কালটা চুরি হয়ে গেল কোন পথে?

বাথরুমের মেঝে পরীক্ষা করতে শুরু করল শহীদ। অস্পষ্ট একটা পায়ের ছাপ দেখতে পেল ও অদ্ভুত এক জায়গায়।

বাথরুমের একদিকের দেয়াল থেকে মাত্র দুই ইঞ্চি এদিকে পায়ের ছাপ। দেয়ালের দিকে মুখ পায়ের আঙ্গুলের। দেয়ালের এত সামনে কেউ কি দাঁড়ায়?

গোপন পথ আছে। মনে মনে অনুমান করল শহীদ। দেয়ালের গায়ে হাত বুলাতে শুরু করল ও। কি যেন ঠেকল হাতে। দেখল শহীদ। একটি অতিক্ষুদ্র বোতাম।

বোতামটায় চাপ দিতেই দেয়ালটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যেতে শুরু করল।

গুপ্ত পথ। হাত দেড়েক ফাঁক হতেই শহীদ পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বালল। ফাঁকটার ওধারে অন্ধকার সিঁড়ি।

কালবিলম্ব না করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল শহীদ।

সিঁড়ি বেয়ে বেশ বড় একটি কামরায় নেমে এল শহীদ। ভাঙা। অব্যবহৃত আসবাবে ঠাসা কামরাটা। কামরায় মোট দুটো দরজা। একটি বন্ধ। অন্যটি খোলা। খোলা দরজার ওধারে আরও একটি কামরা। সেটাও অন্ধকার।

দ্বিতীয় কামরাটির দিকে না গিয়ে শহীদ আসবাবপত্রগুলোর দিকে টর্চের আলো ফেলে কি যেন খুঁজতে শুরু করল।

একটা টেবিলের উপর টর্চের আলো পড়তেই শহীদ দেখতে পেল বরিক তুলোর একটা বান্ডিল। ছেঁড়া তুলোও রয়েছে খানিকটা। রক্তের দাগ দেখতে পেল সে। ডেটলের শিশিটাও চোখে পড়ল।

চশমার কাঁচ ভেঙে যাওয়ায় লোকটা নিশ্চয়ই জখম হয়েছে। পালিয়ে যেতে পারেনি নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে। ধরা ছোঁয়ার মধ্যেই আছে। কিন্তু কোথায়? বন্ধ দরজাটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল শহীদ। কী-হোলে চোখ রেখে দেখল পাশের কামরায় আহাদ চৌধুরী ঘুমুচ্ছে। তার মানে শহীদ যে কামরায় রয়েছে, এই কামরাতেই মিসেস আহাদ নরকঙ্কাল দেখেছিল।

আহাদ চৌধুরীকে ডেকে এ কামরায় আসতে বলবে কিনা ভাবছিল শহীদ। এমন সময় অপ্রত্যাশিত পদশব্দ শোনা গেল পিছনে।

বিদ্যুৎ বেগে ঘুরে দাঁড়াল শহীদ। চমকে উঠে পকেটে হাত ঢোকাতে উদ্যত হল

ও।

একটি নরকঙ্কাল এক এক করে দু'পা এগিয়ে এল। তারপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। শহীদ দেখল কঙ্কালটার দাঁত নেই। শূটিঙের প্রয়োজনে চাবি দেয়া কঙ্কাল। এ কঙ্কালকে হাঁটাতে পারা যায়।

কামরার ভিতরকার আসবাবপত্রগুলো যেন সশব্দে নড়ে উঠল। ঘাড় ফেরাতে গিয়েই বাধা পেল শহীদ।

কঠোর কণ্ঠে নির্দেশ এল, 'পকেট থেকে খালি হাত বের করো, মি. কায়েস। তা না হলে গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।'

ধীরে ধীরে পকেট থেকে খালি হাতটা বের করল শহীদ। সেই সাথে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'আমাকে নিরস্ত্র পেয়ে কোন লাভ হবে না তোমার। তুমি ধরা পড়ে গেছ।'

'তাই নাকি!'

শহীদের পিছন থেকে পিস্তলধারী লোকটি চিবিয়ে চিবিয়ে বলে উঠল, 'তুমি তা হলে জানো আমি কে?'

শহীদ কামরার সম্মুখবর্তী দেয়ালে টর্চের আলো ধরে রেখেছে। ও বলে উঠল, 'হ্যাঁ। আমি যদি তোমার কৌশল দেখে দিশেহারা হয়ে না পড়তাম তাহলে অনেক আগেই চিনতে পারতাম তোমাকে। কৌশলগুলো খুব সুন্দর হয়েছে তোমার—চিৎকারটা, বাথটাবে কঙ্কাল, তোমার নকল দাঁতগুলো সুদ্ধ। অদ্ভুত। তোমার চালে আমরা সবাই মাত্ হয়েছিলাম!'

শহীদ দম নিয়ে পিছন দিকে না তাকিয়েই বলে উঠল আবার, 'কিন্তু তুমি উত্তেজনা এবং অস্থিরতাবশত বিরাট একটা ভুল করেছ। কাসেম বাটকে খুন করা তোমার সবেচেয়ে বড় ভুল। এর ফলে বেশ কয়েক বছর জেলে কাটাতে হবে তোমাকে। ফাঁসিও হয়ে যেতে পারে।'

'না। জেল বা ফাঁসি আমার কপালে নেই, মি. কায়েস। কেন জানো? আমাকে কেউ ধরতে পারছে না। তোমাকে আমি খুন করতে যাচ্ছি, মি. কায়েস। মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হও, দুঃসাহসী। কিন্তু একটা প্রশ্ন করব গুলি করার আগে। রিপোর্টার তুমি, গোয়েন্দাগিরির শখ কেন জাগল?'

'বলতে ভুলে গেছি তোমাকে।'

শহীদ বলল, 'আমি রিপোর্টার নই। আমি একজন ডিটেকটিভ। এখানকার সব ঘটনা এখন আরও অনেকেই জানে।'

লোকটি হাসল খিক্‌খিক্ করে।

বলল, 'তাতে কি! আমি ঠিকই পালাব।'

কিন্তু লোকটি পিস্তলের ট্রিগার টিপে ধরার আগেই শহীদ বিদ্যুৎ বেগে পিছন দিকে লাফ দিল।

অনুমানের উপর নির্ভর করে লাফ দিয়েছে শহীদ। সবেগে ও গিয়ে ধাক্কা খেল

লোকটার বুকের সাথে। ঠিক সেই মুহূর্তে গুলির শব্দ হল।

বুলেট গিয়ে বিঁধল কামরার দরজায়।

লোকটা পড়ে গেল ধাক্কা খেয়ে। শহীদ পড়ল লোকটার পাশে।

শহীদের আগে উঠে দাঁড়াল লোকটা। শহীদের কপাল লক্ষ্য করে লাথি চালাল সে।

শহীদ উঠে বসেছিল মাত্র। চোখের পলকে সরে গেল ও।

লাথি ফসকে যাওয়ায় তাল হারিয়ে ফেলল লোকটা। শহীদ উঠে দাঁড়িয়েই টলটলায়মান লোকটার নাক বরাবর প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারল।

ঘুসি খেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল খুনী। শহীদ এবার লাথি চালাল।

লাথি খেয়ে ছিটকে পড়ল লোকটা দূরে। দুইহাত ঘষতে লাগল সে মেঝেতে। তার ডান হাতটা গিয়ে ঠেকল ছিটকে পড়া পিস্তলটার উপর। খপ্ করে ধরল সেটা। প্রচণ্ড ব্যথা সহ্য করার কষ্ট করতে করতে পিস্তল তুলল সে শহীদের বুক লক্ষ্য করে। শহীদ বিপদ টের পেয়ে লাফ মারল।

কিন্তু গুলির শব্দ হল সেই মুহূর্তেই।

তারপর দুটি শব্দ। দুটি পিস্তল গর্জে উঠেছে।

তীব্র আর্তচিৎকার কানে ঢুকল শহীদের।

লাফ দিয়ে সরে গিয়েছিল শহীদ। কাঁপা হাতের গুলি লাগেনি ওর গায়ে।

শহীদ সিঁড়ির দিকে তাকাল। কুয়াশা দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে। তার এক হাতে একটা কেরোসিন ল্যাম্প। অন্য হাতে পিস্তল।

'লাগেনি তো, শহীদ?' জিজ্ঞেস করল কুয়াশা।

উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্টের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে শহীদ বলল, 'না।'

শহীদ তাকাল মেঝের দিকে। কুয়াশার গুলি খেয়ে নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে লোকটা মেঝেতে মুখ থুবড়ে।

'কে ও?' এগিয়ে আসতে আসতে জিজ্ঞেস করল কুয়াশা।

শহীদ বলল, 'মি. আকবর হোসেন।'

'বলো কি, শহীদ!'

কুয়াশা অবাক।

হ্যাঁ। মরেনি ও। কঙ্কালের মুখে নিজের নকল দাঁত লাগিয়ে বাথটাবে ফেলে রেখেছিল। চিৎকার করে ভুল পথে চালাতে চেয়েছিল আমাদেরকে।

পাশের রুমে আহাদ চিৎকার করে মরছে কখন থেকে কে জানে। শহীদ তার নাম ধরে ডাকল। আহাদের সাড়া পেয়ে খুলে দিল দরজা।

'আর সবাই কোথায়?' জিজ্ঞেস করল শহীদ।

'জানি না। চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুলে ফেলেছি আমি। অথচ কেউ এদিকে আসেনি। ব্যাপার কি, মি. কায়েস?'

শহীদ বলল, 'সবই জানবেন। চলুন, ওদের সকলের খবর নিই।'

কুয়াশা, শহীদ এবং আহাদ বৈঠকখানার উদ্দেশে পা বাড়াল।

বৈঠকখানায় ঢুকে থমকে গেল ওরা তিনজন।

বৈঠকখানার মাঝখানে একটি চেয়ারের সাথে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে পটলার মা অর্থাৎ ডি. কস্টাকে। তার পরনের শাড়ী ভূলুণ্ঠিত। ভিতরে হাফপ্যান্ট দেখা যাচ্ছে।

শহীদ এবং কুয়াশাকে দেখে স্বপন চিৎকার করে বলে উঠল, 'দেখুন মি. কায়েস, পটলার মা বলে যাকে আমরা জানতাম সে একজন পুরুষ মানুষ। আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনছিল। ধরে বেঁধে রেখেছি আমরা। ও বোবাও নয়।'

ডি. কস্টা গম্ভীর ভাবে বলে উঠল, 'হামাকে চরম ইনসাল্ট করা হইয়াছে। হামি বাংলাদেশ গোয়েন্ডা সংস্থার চীফ সেক্রেটারি। মাসে দেড় হাজার টাকা স্যালারী নিই। ফ্রী ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, প্রকাণ্ড ডিনার। ফ্রী বাসস্থান। হামি টোমাডের সবার নামে মানহানির মামলা করিব।'

থুরথুরে এক বুড়ো ওরফে কামাল ঢুকল বৈঠকখানায়। ও বলে উঠল, 'কিন্তু তার আগে আমিও তোমার মান হানির ব্যবস্থা করছি। আমাকে তুমি আকাশে ফ্লাইং সসার দেখাতে গিয়ে কি করেছিলে মনে আছে, কেস্টা? দাঁড়াও। হাটে হাঁড়ি ভাঙছি আমি এখুনি।'

'প্লীজ! নো!'—ডি. কস্টার কণ্ঠে মিনতি।

কুয়াশা ৩৫

প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩

এক

এদিকে রাত বাড়ছে।

সাভারের তালুকদার কটেজের বৈঠকখানায় অটুট নিস্তব্ধতা।

আহাদ চৌধুরী, মিসেস আহাদ, স্বপন, সবিতা, টেকনিশিয়ান এবং ক্যামেরাম্যান সবাই হাঁ করে তাকিয়ে আছে শহীদের দিকে। কারও মুখে কোন কথা নেই।

শহীদ এই মাত্র নিজের, কামালের কুয়াশার এবং ডি.কস্টার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করেছে। নিজেদের ছদ্মবেশ নেবার কারণটাও ব্যাখ্যা করতে ভোলেনি শহীদ। সেই সাথে প্রকৃত মি. তালুকদার হত্যাকারীর পরিচয় এবং সেই হত্যাকারীকে কেন মি. আকবর খুন করেছেন তাও সে ব্যাখ্যা করে জানিয়ে দিয়েছে।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেছে সবাই। এমতাবস্থায় পুলিস ডাকা উচিত।

একটি কেসের সমাধান হলে স্বভাবতই পরবর্তী কর্তব্য চাপে পুলিসের কাঁধে। পুলিস এসে জেরা করে, জবানবন্দী নেয়, ফটোগ্রাফারকে দিয়ে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করে, খুনীর ছবি তোলে, হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্স আসে।

কিন্তু সেই রাতে তালুকদার কটেজে কোন পুলিস এল না, এল না, কারণ আসা সম্ভবও ছিল না।

ছেঁড়া তার জোড়া লাগিয়ে ডায়াল করে কানেকশন পাওয়া গেল না থানার সাথে। কেননা সেটা ছিল উনিশ শো একাত্তরের পঁচিশে মার্চের অভিশপ্ত রাত।

উপরতলায় ফোন করতে গিয়েছিল কামাল এবং ডি.কস্টা।

রাত তখন এগারোটার উপরে।

কয়েকবার ডায়াল করে কোন সাড়া না পেয়ে কামাল মুখ তুলে তাকাল।

ডি.কস্টা বলল, 'ডারোগা বাবু বোডহয় স্লিপিং ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন!'

কামালকে কিন্তু চিন্তিত মনে হলো। কি যেন বলতে যাচ্ছিল ও। কিন্তু প্রচণ্ড একটা বাধা পেল তখুনি।

নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল কামাল খোলা জানালার দিকে।

তড়াক করে লাফ মারল ডি.কস্টা। সোজা খাটের নিচে গিয়ে আশ্রয় নিল সে।

নারী কণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এল নিচতলা থেকে। পরিষ্কার বোঝা গেল না। কেননা চারিদিক থেকে অকস্মাৎ শোনা যাচ্ছে মর্টার, রাইফেল, এল. এম. জি, স্টেনগান এবং গ্রেনেডের কান ফাটানো আওয়াজ।

দুই

ওরা বর্বর। ওরা পশু। নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালী জাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে পিশাচরা। বাংলাদেশে তখন গভীর রাত। বাঙালীরা তখন অঘোর ঘুমের ভিতর অচেতন। শত্রুরা অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল। শক্তি মদমত্ত পশু-সেনারা বিকট উল্লাসে সূচনা করল ইতিহাসের নিকৃষ্টতম, ঘৃণ্যতম নরমেধযজ্ঞের!

চমকে উঠল শহরবাসীরা! মৃত্যুভয় গ্রাস করতে এল নিরীহ মানুষগুলোকে। কিন্তু মরার আগে রুখে দাঁড়াল তারা।

ব্যারিকেড সৃষ্টি হলো।

ব্যারিকেড ভেঙে শত্রুবাহিনীর ইস্পাতের তৈরি ট্যাঙ্ক তুমুল বেগে এগিয়ে এল শত শত বাঙালী বীরের লাশের উপর দিয়ে। রক্তাক্ত হলো রাজপথ। ভাঙল সোনার সংসার। মা সন্তানকে হারাল। স্ত্রী স্বামীকে খুন হতে দেখল। ভাই দেখল ভাইকে শহীদ হতে।

কিন্তু তবু ভেঙে পড়ল না বাঙালী জাতি। জাতির এই দুর্দিনে প্রতিটি বাঙালী প্রতিজ্ঞা নিল। নিজের মা, বাবা, ভাই, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধুর লাশ দেখে তারা অটল হলো নিজ নিজ প্রতিজ্ঞায়। দখলদার বাহিনীকে উৎখাত করতে হবে। বাংলাদেশকে করতে হবে স্বাধীন। চাই রক্তের বদলে রক্ত।

'চাই রক্তের বদলে রক্ত!'

দাঁতে দাঁত পিষে বলে উঠল শহীদ। কামরার ভিতর অন্ধকার।

'স্বাধীনতা চাই। বাঁচার মত বাঁচতে চাই। মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে চিৎকার করে উঠল কামাল।'

'ওরা আত্মঘাতী কাজ করে বসেছে।'

বলল কুয়াশা, 'ওরা জানে না আমাদের প্রতিশোধ কী ভয়ঙ্কর হবে। যে অপরাধের সূচনা আজ ওরা করল তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ওদেরকে যুগ যুগ ধরে। ওরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ওরা ধ্বংস হয়ে যাবে।'

শহীদ পায়চারি থামিয়ে দাঁড়াল কুয়াশার মুখোমুখি। চোখ দুটো লাল ওর। পলক পড়ছে না। থমথম করছে মুখের চেহারা। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে। ছোট একটা মোমবাতি জ্বালাল কামাল।

'আমি বেরিয়ে পড়তে চাই, কুয়াশা।'

কথাটা বলে শহীদ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কুয়াশার দুই চোখের দিকে।

তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি ভাবছ?'

শহীদের প্রশ্নের উত্তর দিল প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ। ট্যাঙ্ক থেকে গোলাবর্ষণ করা হচ্ছে অদূরে কোথাও। বিস্ফোরণের পরই মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ার।

কুয়াশা শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠল, 'চলো, বেরিয়ে পড়ি আমরা, শহীদ।'

'ঘরের ভিতর বসে থাকা আমাদের সাজে না।' বলল কামাল, 'কিন্তু কোথায় যাব আমরা? বাইরে বেরুতে হলে শত্রুর সাথে মোকাবিলা করার জন্যে তৈরি হয়েই বেরুতে হবে। অস্ত্র কোথায় আমাদের?'

'অস্ত্র নেই আমাদের হাতে। কিন্তু শত্রুদের আছে। ওদের হাতের অস্ত্র কেড়ে নেব আমরা। মুক্তিযোদ্ধাদের অন্য কোন উপায় নেই অস্ত্র সংগ্রহের।'

শহীদ কথাগুলো বলে মি. আহাদকে কিছু উপদেশ দেবার জন্য পাশের কামরার দিকে পা বাড়াল। মি. আহাদ তার লোকজন নিয়ে পাশের কামরায় অবস্থান করছেন। সেখান থেকে ভীত কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে থেকে থেকে। মিসেস আহাদ এবং মিস সবিতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মাঝেমধ্যে।

তিন

মি. আহাদ বাধা দেবার চেষ্টা করল। বলল, 'এই বিপদে কি কেউ বাইরে বের হয়? স্বীকার করলাম আপনারা অভিজ্ঞ মানুষ। ডাকাত, খুনী, অপরাধীদলদের সাথে লড়েছেন। কিন্তু আপনাদের সে অভিজ্ঞতা কি কোন কাজে লাগবে? একটি গোটা দেশের দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী সাড়ে সাত কোটি নিরস্ত্র নিরীহ মানুষের উপর আধুনিক সকল প্রকার অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কি করবেন আপনারা? ওদের সাথে যুদ্ধ করবেন? হাস্যকর হবে না সেটা?'

শহীদ বলল, 'হাস্যকর আপনার কথাগুলোই। কি করতে বলেন? ওরা মারবে আমাদেরকে আর আমরা তা চুপ করে সহ্য করব বলতে চান? তাহলে তো ক্রীতদাসে পরিণত হবে গোটা জাতটা। আপনি একটি জিনিস ভুল করছেন। আপনি শত্রুবাহিনীর শক্তিকে দেখছেন বড় করে। কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলেই বুঝতে পারবেন যে একটি সেনাবাহিনী, তা যতই বর্বর বা বিরাট হোক, একটি জাতির সমান তার কোনই ক্ষমতা নেই। জাতি যদি পাল্টা আঘাত হানে তাহলে নিমেষের মধ্যে চুরমার হয়ে যাবে বর্বর পাকিস্তানী সেনাদের সর্বশক্তি। থাকগে, বিষয়টা তর্ক সাপেক্ষ নয়। এটা ধ্রুব সত্য। বাঙালী জাতি এই পিশাচদের ক্ষমা করবে না। ভয়কে জয় করতে আমরা জানি। আমাদের অস্ত্র নেই, অস্ত্র আমরা কেড়ে নেব। জনবলই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় বল। আমাদের তা আছে। সাড়ে সাতকোটি বাঙালীই আজ থেকে এক একজন যোদ্ধা। মাতৃভূমিকে মুক্ত করার শপথ নিয়ে আমরা বিদায় নিচ্ছি। আমরা আগে যাচ্ছি, আমাদের দেখাদেখি আপনারাও আসবেন। আসবে আপামর

জনসাধারণ। শুনতে পাচ্ছেন না?'

শহীদ প্রশ্ন করে চুপ করে রইল কয়েকমুহূর্ত। মেশিনগানের অবিরাম শব্দ হচ্ছে দূরে। তার মাঝেও শোনা যাচ্ছে রাইফেলের শব্দ। থেকে থেকে কেঁপে উঠছে কামরা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে।

'শুনতে পাচ্ছেন ক্রশ ফায়ারের শব্দ? কারা বাধা দিচ্ছে বলুন তো বর্বর সেনাবাহিনীকে? বাঙালী যোদ্ধারা। না, আর দেরি নয়। আমরা চললাম। আপনারা থাকুন। সকাল হোক। সুযোগ এবং সময় মত ঢাকায় ফেরবার চেষ্টা করবেন। অহেতুক ভয় পাবেন না।'

মি. আহাদ বলে উঠলেন, 'আপনার কথা শুনে রক্ত গরম হয়ে উঠেছে আমার, মি. শহীদ। আমার ইচ্ছা হচ্ছে…।'

শহীদ হেসে উঠে বলল, 'আমাদের সাথে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে, এই বলতে চান তো? না, ভাই। আপনার সাথে মেয়েরা রয়েছেন। ওদেরকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেয়া দরকার। আপনি পরিচালক, সে দায়িত আপনারই। দায়িত্ব পালন করুন। তারপর, সময় তো পড়ে রয়েছে, সুযোগ মত দেশের ডাকে সাড়া দেবেন। কিন্তু আজ নয়। চললাম।'

শহীদ বেরিয়ে এল কামরা থেকে।

শহীদকে দেখেই কুয়াশা প্রশ্ন করল, 'এবার বেরিয়ে যেতে পারি আমরা?'

শহীদ বলল, 'হ্যাঁ।'

কুয়াশা জোর গলায় ডাকল, 'মি. ডি.কস্টা!'

কামাল অবাক কণ্ঠে বলে উঠল, 'আরে তাই তো। ডি.কস্টা গেল কোথায়?'

ডি.কস্টা কামালের সাথে দোতলা থেকে নেমেই আত্মগোপন করেছে ল্যাট্রিনে।

কুয়াশার ডাক শুনে ডি.কস্টা ল্যাট্রিন থেকে বেরিয়ে এল হামাগুড়ি দিতে দিতে।

কামরার দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকেই ডি.কস্টা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'গড সেভ মি।'

'হামাগুড়ি দিচ্ছেন কেন, উঠে দাঁড়ান।'

কুয়াশার কথা শেষ হতেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। দুর্বোধ্য স্বরে চিৎকার করে উঠল ডি. কস্টা। কুয়াশা ধমক মারল এবার, 'অমন চেঁচাচ্ছেন কেন? শব্দটা এসেছে দূর থেকে। খামকা ভয় পাবেন না।'

কামাল বলল, 'এ লোককে নিয়ে বাইরে বেরুনো যায়, কুয়াশা?'

ডি. কস্টা এক লাফে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'বাজে কঠা কইবেন না, মি. কামাল। আমাকে নিয়ে বাইরে যেটে ভয় পাইটেছেন? রঙ, ফ্রেণ্ড, রঙ। আমিই এখন একমাত্র আপনাদিগের সহায়। আপনারা, কালা আদমি কালা আদমি মারামারি করবেন, রায়ট করবেন, কিনটু আমি ওসবে নাই। আমাকে কেউ কিছু বলবে না। আমি ইংরেজের জাট, বাঙালী নই বা পাঞ্জাবী নই। আমার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুন,

মিলিটারি স্যাল্যুট করে পঠ ডেখিয়ে ডেবে।'

কামাল বলে উঠল, 'তা যা বলেছেন। তবে তাই হোক। আপনিই আমাদেরকে নিয়ে চলুন। চলুন, পা বাড়ান।'

ডি.কস্টা মুখ বিকৃত করে বলে উঠল, 'কিনটু, প্রথমে জানা ডরকার বাহিরে কি ঘটিতেছে। ফায়ারিঙয়ের আওয়াজ, কেন হচ্ছে? কারা ফায়ারিঙ করছে? কারা মরছে? ফাইট দুই ডলে হচ্ছে কি না?'

শহীদ এবং কুয়াশা নিজের নিজের রিভলভার বের করে পরীক্ষা করে নিচ্ছে। ডি. কস্টার কথায় ওদের মনোযোগ আছে বলে মনে হয় না। দুজনকেই অসম্ভব গম্ভীর দেখাচ্ছে।

কামাল উত্তরে বলে উঠল, 'কি হচ্ছে জানতে চান?'

'ইয়েস। ইংরেজের জাট ডিটেলস না জেনে এক পাও এগোয় না।'

কামাল বলল, 'বাঙালীরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে আজ রাতে। তারা পাঞ্জাবীদের গোলামী আর করবে না। পাঞ্জাবীরা নিরস্ত্র বাঙালীদেরকে যেখানে পাচ্ছে সেখানেই খুন করছে। কোন বাছবিচার নেই। বাড়িঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে। রাস্তায় যাকে পাচ্ছে গুলি করছে। ওদের লক্ষ্য প্রতিটি বাঙালীকে খুন করা। বাঙালীরা একচেটিয়াভাবে মার খাচ্ছে। কারণ তাদের হাতে অস্ত্র নেই। কিন্তু তবু তারা প্রতিজ্ঞা নিয়েছে দেশকে শত্রুমুক্ত করার।'

'আই অ্যাম এ লাকী ম্যান, কারণ আমি বাঙালী নই বা পাঞ্জাবী নই। টোমরা টোমরা ফাইট করো, আমি ডুরে ডাঁড়িয়ে মজা ডেখব। ডরকার হলে হাট টালি ডেবো।'

কামাল বলে উঠল, 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ডি.কস্টা। মজা দেখতে দেব ভেবেছ? বাঙালীরা পাঞ্জাবীদেরকে এ দেশের মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন তো করবেই, যারা এই বিপদে অসহযোগিতা করবে তাদেরও বংশ ধ্বংস করে ছাড়বে। এ দেশে যদি থাকতে চাও বাঙালীদের সাথে মিল-মহব্বত রেখে থাকো। তা না হলে স্রেফ খুন হয়ে যাবে। চলো, আগে বাড়ো।'

ডি.কস্টা কান পেতে শুনছে গোলাগুলির শব্দ। কামালের কথা সে শুনতে পায়নি।

কামাল বলে উঠল, 'ওকি, ডি.কস্টা তোমার পা দুটো অমন থরথর করে কাঁপছে কেন?'

ডি.কস্টা নিজের পা দুটোর দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর ধীরে ধীরে মুখ তুলল সে। কাঁদ কাঁদ মুখ।

ডি.কস্টা বলে উঠল, 'মি. কামাল, ফরগিভ মি। অনেকক্ষণ ধরে ট্রাই করার পরও লেগ দুইটাকে চেক করিটে পারিলাম না।'

কামাল জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু পা দুটো অমন ঠকঠক করে কাঁপছে কেন বলো

তো?'

ডি.কস্টা কোন রকমে বলল, 'ডিসিশন নিটে পারছি না বলেই, আই গেস। আপনার কঠা শুনে মনে হইটেছে যে বাঙালীদের এগেইন্স্টে কিছু করা চলিবে না। রেজাল্ট বড় ব্যাড হবে। কিন্টু পাঞ্জাবীডের এগেইন্স্টেই বা যাই কি প্রকারে? ওডের রক্ত বড় গরম। ব্যাটাডের মাঠায় এক ফোঁটা বুডটি নাই। ডুম করে গুলি করে ডিলে?'

চার

অসমসাহসী ক'জন বাঙালী ওরা তালুকদার কটেজ থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে মিলিয়ে গেল দুর্যোগপূর্ণ অন্ধকারে।

সতর্ক পায়ে, চোখ-কান খুলে পিছু পিছু বড় রাস্তার দিকে পা বাড়াল শহীদ, কুয়াশা, কামাল এবং পিছু পিছু ডি.কস্টা।

বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ। আকাশেও নেই চাঁদ। মৃদু শীতের আমেজ মার্চের রাতে। সুদূর আকাশে গুটিকতক তারা জ্বলছে। তাদেরই মৃদু আভায় পথ দেখে দুর্জয় প্রতিজ্ঞা বুকে নিয়ে গুটি গুটি এগিয়ে চলেছে ওরা।

কুয়াশা এবং শহীদ পাশাপাশি হাঁটছে। রাস্তা লাগোয়া উঁচু পাঁচিল। পাঁচিল ঘেঁষে হাঁটছে ওরা।

ওদের পিছনে কামাল। কামালের পিছনে ডি.কস্টা।

কুয়াশা এবং শহীদের হাতে রিভলভার। পিছনে কামাল, ওর হাতেও রিভলভার। নিজেদের গাড়ি নিয়ে বেরোয়নি ওরা। বাইরে নিশ্চয়ই কারফিউ।

দু'একবার পিছন ফিরে তাকাচ্ছে কামাল। ঠক ঠক করে শব্দ হচ্ছে থেকে থেকে।

ডি.কস্টা কাঁপছে। দাঁতে দাঁতে বাড়ি লেগে অমন ঠক ঠক শব্দ হচ্ছে। ঠাণ্ডায় না ভয়ে কে জানে।

গোলাগুলির শব্দে উচ্চকিত চারদিক। বিরামহীন।

'পৃথিবীর ইতিহাসে এই নৃশংসতার কোন তুলনা নেই।'

কামাল বলে উঠল।

'ক্রিটিসাইজ করো না!'

কামালের কথা বুঝতে না পেরে পিছন থেকে বলল ডি.কস্টা।

শহীদ উত্তর দিল কামালের কথার। ও বলল, 'ওদের দুর্ভাগ্যেরও কোন তুলনা থাকবে না। ওরা জানে না নিজেদের কী সর্বনাশ ঘটাচ্ছে ওরা।'

কুয়াশা বলল, 'পৃথিবীর ইতিহাসে ওরা খুনী হিসেবে চিহ্নিত থাকবে।'

অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না সামনের পথ। দূর থেকে ভেসে আসছে অবিরাম গোলাগুলির শব্দ। মাঝেমধ্যে ভারি ট্রাকের শব্দও আসছে।

বড় রাস্তা দেখা গেল খানিক পর। চলার গতি কমল ওদের।

তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে এগিয়ে চলেছে ওরা। চিন্তিত হয়ে পড়েছে শহীদ। বাঙালীর জীবনে নেমে এসেছে কল্পনাতীত বিপদ। এ বিপদ থেকে পরিত্রাণ নেই যেন। পাঞ্জাবীদের এই চরম আঘাত সহ্য করলে চলবে না। পাল্টা আঘাত হানতে হবে। তবেই এ জাতির মুক্তি।

শত্রুপক্ষ শক্তিশালী। তাদের হাতে অস্ত্র। আছে কূটবুদ্ধি। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো তাদেরকেই নিঃসন্দেহে সমর্থন করবে। কেননা পাঞ্জাবীরা সাম্রাজ্যবাদীদের পা-চাটা কুকুর।

বাঙালীরা নিরস্ত্র। মুষ্টিমেয় ই. পি. আর. এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের কিছু বীর ছাড়া যুদ্ধে তারা অভিজ্ঞ নয়। বাঙালীদের মধ্যে ক'জনই বা রাইফেল-বন্দুক চালাতে জানে। কিন্তু তবু নিরাশ হবার মত কিছু নেই। নির্বাচনের পর একথা নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে বাঙালীরা মানুষের মত নিজেদের অধিকার নিয়ে বাঁচতে চায়। তারা শোষকদের প্রভূত্ব চায় না। তারা নিজেদের অধিকার কায়েম করতে দরকার হলে আন্দোলন করতে প্রস্তুত ছিল, ত্যাগের পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত ছিল। আন্দোলন তারা করেছেও, ত্যাগেরও পরীক্ষা তারা দিয়েছে। কিন্তু পাঞ্জাবীরা কোন মূল্য দেয়নি। তারা আলোচনার নামে সময় নিয়েছে শুধু। তৈরি করেছে বর্বর সেনাবাহিনীকে। বাঙালী হত্যার নির্মম পরিকল্পনা রচনা করেছে চুপি চুপি। প্রস্তুতি শেষ হতেই তারা মুখোশ খুলে ফেলে ধারাল দাঁত বের করে নগ্নভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাঙালী হত্যায়।

কিন্তু বাঙালীরাও প্রস্তুত। তারা অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত না থাকলেও মানসিকভাবে পুরোপুরি প্রস্তুত। হয় অধিকার চাই, নয়ত সম্পর্কচ্ছেদ চাই, এই ছিল বাঙালীদের কথা। মুখ বুজে মার খাবার দিন আর নেই, বাঙালীরা তা খায়ওনি। কারফিউ দিয়ে চেষ্টা কি করেনি পাঞ্জাবী সেনারা? করেছিল বৈকি। কিন্তু বাঙালীরা সেই কারফিউও মানেনি। কারফিউয়ের মধ্যেও তারা বের করেছে মিছিল। সে মিছিলের শ্লোগান ছিলঃ ভুট্টোর মুখে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।

যে জাতি কারফিউ মানে না, ঝাঁক ঝাঁক বুলেটকে পরোয়া করে না সে-জাতিকে দমন করে রাখে, দাবিয়ে রাখে এমন শক্তি পৃথিবীতে কোথায়? না, বাঙালীরা স্বাধিকার অর্জন করবেই। হয়ত দু'দিন দেরি হবে, কিন্তু সে বিলম্ব রক্তদানে দ্বিধার হেতু নয়। রণকৌশলগত কারণেই দেরি হবে।

শহীদ যেন মানসচক্ষে দেখতে পেল বাঙালীরা স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে গেরিলা যুদ্ধ করছে।

'শহীদ, আমাদের প্রথম কাজ একটা মিলিটারি ট্রাক বা জীপ যোগাড় করা।' কুয়াশা বলে উঠল।

বড় রাস্তার মুখ দেখা যাচ্ছে অদূরে। নির্জন রাস্তা। মোড়ের প্রায় কাছাকাছি

পৌঁছে গেছে ওরা।

ঢাকায় কি ঘটছে?

বর্বর সেনারা নিশ্চয়ই প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে ঢাকায়। কিন্তু ঢাকাবাসীরা কি বসে আছে ঘরে? বিশ্বাস হয় না। বাধা দেবেই তারা। বিশ্বাসঘাতকদেরকে ছেড়ে দেবে না ঢাকাবাসীরা। পীলখানায় আছে শত শত বাঙালী রাইফেলধারী। তারা নিশ্চয়ই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। রাজারবাগে আছে পুলিস বাহিনী। স্ট্রীট ফাইট শুরু হয়েছে নিশ্চয়ই। বর্বর খান-সেনারা নিশ্চয়ই বাধার সম্মুখীন হয়েছে।

মহুয়ার কথা মনে পড়ল শহীদের। ধানমণ্ডির অবস্থা কেমন কে জানে। গফুর ছাড়া পুরুষ মানুষ নেই কেউ। লীনা এবং মহুয়া দুশ্চিন্তায় জর্জরিত হচ্ছে শহীদ এবং কামালের জন্যে। হঠাৎ একটা আশঙ্কায় দুলে উঠল শহীদের বুক।

পাঞ্জাবী সেনারা বাঙালীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সাথে সাথে বাছাবাছা কিছু মানুষকে খুন করার চেষ্টা নিশ্চয়ই চালাবে। রাজনৈতিক নেতা, বিপ্লবী ছাত্র, গণ্যমান্য নাগরিকরা বোধহয় শিকার হবে। শহীদকে কি খুঁজবে বর্বরেরা?

চিন্তিত হয়ে পড়ল শহীদ। ওর খোঁজে যদি পাঞ্জাবী সেনারা ধানমণ্ডির বাড়িতে যায় তাহলেই সর্বনাশ! শহীদকে না পেয়ে মহুয়া এবং লীনার উপর অত্যাচার···।

পাঁচ

মোড়ের মাথায় একটি দোতলা বাড়ি। বাড়িটার পাশে দাঁড়াল ওরা চারজন।

শহীদ বলল, 'রাস্তার দু'দিক দেখে নেয়া যাক।'

কামাল বলল, 'গাড়ির শব্দ শুনতে পাচ্ছিস, শহীদ?'

কুয়াশা উত্তর দিল হ্যাঁ। গাড়ির শব্দ এগিয়ে আসছে।

শহীদ বলল, 'সম্ভবত, একটা ট্রাক।'

পা বাড়াল শহীদ। পাশে কুয়াশা।

কয়েক পা এগিয়ে দাঁড়াল ওরা। উঁকি মেরে চওড়া রাস্তার দুই দিক দেখল।

নির্জন পাকা রাস্তা। দক্ষিণ দিক থেকে আসছে ভারি একটা ট্রাক। হেডলাইট দুটো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এখনও অনেক দূরে সেটা।

শহীদ বলল, 'পজিশন নিতে হয়। ট্রাক যদি একটাই হয় তাহলে আক্রমণ করব। আমি রাস্তার ওপারে যাচ্ছি। কামাল, তুই ওই ডাস্টবিনের আড়ালে চলে যা ডি.কস্টাকে নিয়ে।'

কুয়াশা বলল, 'আমি ডাস্টবিনের পাশের ওই শিমুল গাছটায় চড়ি।

শহীদ বলল, 'আমি ওপারের গাছটার নিচে থাকব। ড্রাইভারকে গুলি করে খতম করতে হবে। তিনজনই যে যার সময় এবং সুযোগ মত গুলি করব।'

এগিয়ে গেল শহীদ।

কামাল দুই লাফে ডাস্টবিনের পিছনে গিয়ে বসে পড়ল।

তরতর করে উঠে গেল কুয়াশা শিমুল গাছের উপরে।

শহীদ রাস্তার ওপারে পৌঁছেছে। রাস্তার ওপারে খানিকটা জায়গা জুড়ে ঘাস, তারপর নিচু হয়ে নেমে গেছে জমি। নিচে ধানখেত। ফাঁকা।

শহীদ রাস্তা ছেড়ে আরও কয়েক হাত এগিয়ে একটি গাছের আড়ালে গিয়ে শুয়ে রইল।

ডি.কস্টা কোথায়? কামাল এদিক ওদিক তাকিয়ে কোন ছায়া দেখতে পেল না। লোকটা গেল কোথায়? কুয়াশার সাথে গাছে গিয়ে চড়ল নাকি?

পরমুহূর্তে ব্যাপারটা টের পেল কামাল। ওর সামনেই ডাস্টবিন। ডাস্টবিনের ভিতর কেউ আছে। নড়ছে সেটা। নিশ্চয়ই ডি.কস্টা।

শহীদ রিভলবার নিয়ে তাকিয়ে আছে দক্ষিণ দিকে। দ্রুত এগিয়ে আসছে হেডলাইট দুটো। বিরাট একটা ট্রাকই সম্ভবত। হেডলাইট দুটো বেশ উঁচুতে।

কুয়াশাও তাকিয়ে আছে।

তাকিয়ে আছে কামালও।

কাছে এগিয়ে এসেছে ট্রাকটা। বড় জোর শ খানেক গজ দূরত্ব।

ট্রিগারে আঙুল রেখে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে আছে ওরা।

ট্রাকের ভিতর পাঞ্জাবী সেনা কতজন আছে কে জানে। ড্রাইভারের গায়ে গুলি লাগলে ট্রাকটা দিকভ্রান্ত হতে বাধ্য। হয় রাস্তার একপাশের কোন বাড়ির পাঁচিলের সাথে ধাক্কা খাবে, নয়ত সোজা গিয়ে পড়বে নিচু ধান খেতে। বাড়ি মাত্র কয়েকটা, ছাড়াছাড়া ভাবে।

এগিয়ে এসেছে ট্রাক। কিন্তু এখনও গুলি করার সময় হয়নি। ড্রাইভারের গায়ে লাগা চাই বুলেট।

তৈরি হয়ে আছে ওরা। জানালা পথে ড্রাইভারকে দেখামাত্র গুলি করবে ওরা।

আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার।

কিন্তু তার আগেই দিক-বিদিক সচকিত করে দিয়ে গর্জে উঠল একটি রাইফেল।

চমকে উঠল ওরা।

রাইফেল কোথা থেকে এল?

কিন্তু তখন অন্য কথা ভাববার কোন অবসর নেই।

শহীদ গুলি করল।

গুলি করল কুয়াশা।

কামালও হয়ত গুলি করল, কিন্তু শোনা গেল না তার রিভলবারের শব্দ। শহীদ এবং কুয়াশার রিভলবারের শব্দ হবার পরপরই একযোগে গর্জে উঠল কয়েকটা স্টেনগান।

ব্রাশ ফায়ার।

শহীদের একহাত সামনে এক ঝাঁক বুলেট পড়ল। নিঃসাড় পড়ে রইল শহীদ।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ওর চোখে। বুকটা ভরে উঠল সাফল্যের আনন্দে। ভারি ট্রাকটা ঝড়ের বেগে এগিয়ে যাচ্ছে একটি বাড়ির পাঁচিলের দিকে।

গাছ থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামল কুয়াশা। নেমেই ছুটল সে।

শহীদও ছুটল।

পিছন ফিরে তাকাল একবার কুয়াশা। সেই মুহূর্তেই ট্রাকটা পাঁচিলের সাথে প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা খেল।

ছুটছে কুয়াশা ট্রাকটার দিকে। রাস্তার অপর পারে শহীদ। সে-ও ছুটছে।

অনেক পিছনে কামাল। সে-ও এগিয়ে যাচ্ছে।

দাঁড়িয়ে পড়েছে ট্রাকটা।

অকস্মাৎ কুয়াশার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'শহীদ, শুয়ে পড়ো।

ডাইভ দিয়ে শুয়ে পড়ল শহীদ। পরক্ষণেই গর্জে উঠল স্টেনগান। মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক বুলেট উড়ে গেল।

ধীরে মাথা তুলে তাকাল শহীদ। ট্রাকের পিছন থেকে নামছে পাঞ্জাবী সেনারা।

গুলি করল শহীদ।

দুটো শব্দ হলো। কুয়াশাও গুলি করেছে। বিকট আর্তচিৎকারে ভারি হয়ে উঠল চারদিকের বাতাস। দুই শত্রু অক্কা লাভ করল।

আবার লক্ষ্যস্থির করল শহীদ। কিন্তু ট্রিগারে চাপ দেবার আগেই শোনা গেল রাইফেলের শব্দ।

চমকে উঠে পিছনে তাকাল শহীদ।

অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না। তবু আবছাভাবে শহীদ দেখল রাস্তার মাঝখান দিয়ে কালো একটি ছায়ামূর্তি দ্রুত এগিয়ে আসছে বুকে হেঁটে।

কে এই লোক?

ছায়ামূর্তি কাছাকাছি আসতে শহীদ বলে উঠল, 'আর সামনে যাবেন না!

উত্তর দিল না ছায়ামূর্তি। ক্রল করে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে সে।

শহীদ অবাক বিস্ময়ে ভাবল কে এই অসমসাহসী লোক।

কুয়াশাও দেখল ছায়ামূর্তিকে। কাছাকাছি দেখে সে বলল, 'এখান থেকেই গুলি করুন।'

অসমসাহসী সেই যুবক কুয়াশার কথা শুনে তার গতি রুদ্ধ করল। হাতের রাইফেলটা তাক করল ট্রাকের দিকে। তারপর ট্রিগারে দিল টান।

প্রচণ্ড শব্দ হলো থ্রী-নট-থ্রী রাইফেলের। আবার শোনা গেল পাঞ্জাবী সেনার অন্তিম চিৎকার। সেই চিৎকার থামার আগেই আবার গুলি করল ছায়ামূর্তি।

আবারও শোনা গেল শত্রুসেনার আর্তনাদ। তারপরই থেমে গেল স্টেনগানের শব্দ।

অন্ধকারে যেন চোখ জ্বলে ছায়ামূর্তির। আবার সে গুলি করল। আবার শোনা

গেল শত্রুসেনার মৃত্যু চিৎকার।

তারপর আবার শুরু হলো স্টেনগানের শব্দ।

শহীদও ক্রল করে এগিয়ে এসেছে।

পিছন ফিরে তাকাল ছায়ামূর্তি। তারপর আবার ক্রল করে এগিয়ে যেতে শুরু করল।

কুয়াশা মনে মনে বিস্ময় মানল। লোকটা মরতে চায় নাকি? দূর থেকে যখন গুলি করে ফল পাওয়া যাচ্ছে তখন আরও সামনে এগিয়ে যাবার মানে কি!

দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে ছায়ামূর্তি। তার অনেকটা পিছনে কুয়াশা এবং শহীদ।

স্টেনগানের শব্দ থেমে গেছে। ট্রাকটা দাঁড়িয়ে আছে বটে কিন্তু স্টার্ট বন্ধ হয়নি। পাঁচিল ভেঙে ট্রাকের নাকের খানিকটা ঢুকে গেছে বাড়িটার উঠানে।

ছায়ামূর্তি এগিয়ে যাচ্ছে! তেরপল দিয়ে ঘেরা ট্রাক। পিছনটা দেখা যাচ্ছে। কোন পাঞ্জাবী সেনাকে দেখা যাচ্ছে না। ছায়ামূর্তি ট্রাকের পিছনে গিয়ে থেমেছে। উঠে দাঁড়াচ্ছে সে।

প্রায় ছয় ফুটের মত লম্বা ছায়ামূর্তি। স্বাস্থ্যবান বলা যায় না। তবে রোগাও নয়। বুক টান করে উঠে দাঁড়িয়েছে সে। এমন সময় আশ্চর্য এক কাণ্ড ঘটল।

ট্রাকের ভিতর থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল একটি খান-সেনা। তার হাতে একটা ছোরা। স্টেনগানের গুলি শেষ হয়ে গেছে নিশ্চয়ই।

পাঞ্জাবী বর্বরটা ঝাঁপিয়ে পড়ল ছায়ামূর্তিকে লক্ষ্য করে।

ছয়

শঙ্কায় দুলে উঠল শহীদের বুক। গুলি করতে গিয়েও নিজকে সামলে নিল ও। গুলি করা বৃথা। ঝাঁপিয়ে পড়েছে ইতিমধ্যে শত্রু ছায়ামূর্তির উপর।

ছায়ামূর্তি বিদ্যুৎ বেগে সরে গেল এক পা। কিন্তু পালাবার কোন লক্ষণ তার মধ্যে দেখা গেল না।

ছোরা চালিয়েছিল পাঞ্জাবী সেনা। কিন্তু বিদ্যুতের চেয়েও দ্রুত সরে গিয়েছিল বলে আঁচড়টিও লাগেনি ছায়ামূর্তির গায়ে।

ছোরা ধরা হাতটা ধরে ফেলল ছায়ামূর্তি। তারপর শত্রুর বাঁ-পায়ের হাঁটুর উপর প্রচণ্ড শক্তিতে মারল এক লাথি। আর্তনাদ করে উঠল শত্রু। ছিটকে পড়ল কয়েক হাত দূরে। ছায়ামূর্তি এক লাফে ভূপাতিত দেহটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। প্রচণ্ড এক লাথি মেরে আহত শত্রুর দেহটাকে উপুড় করে সে। তারপর ছায়ামূর্তির লম্বা শরীরটা নুয়ে পড়ল।

শত্রুর পিঠে ডান পা রাখল ছায়ামূর্তি। এক হাত দিয়ে ধরল শত্রুর গলা পেঁচিয়ে। তারপর শত্রুর গলা উঁচু করে ধরল।

মট করে শব্দ হলো একটা।

শিউরে উঠল শহীদ। কী ভয়ঙ্কর শক্তি ছায়ামূর্তির শরীরে। পাঞ্জাবী শত্রুর মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলেছে সে।

কুয়াশা ছায়ামূর্তির সামনে এসে দাঁড়াল। একটা হাত রাখল সে ছায়ামূর্তির কাঁধে।

কুয়াশা এবং ছায়ামূর্তি, দু'জন প্রায় একই সমান লম্বা। কিন্তু কুয়াশার চেয়ে বয়স অনেক কম ছায়ামূর্তির। সবেমাত্র দাড়ি-গোঁফ কামাতে ধরেছে সে। আঠারো কি উনিশ হবে বয়স। কিন্তু অদ্ভুত স্বাস্থ্য। পেশীবহুল শরীর। বলিষ্ঠ।

'সাবাশ! তোমার মত ছেলেই দরকার বাঙলার এই বিপদের দিনে। নাম কি তোমার? পরিচয় কি?

যুবকের কণ্ঠস্বর যেমন ভরাট তেমনি পুরুষোচিত। সে বলল, 'রাসেল। রাসেল আহমেদ। জগন্নাথ কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি। আপনার পরিচয় জানতে পারি কি?'

ভারি কণ্ঠস্বর কুয়াশার। সে বলল, 'আমার নাম মনসুর আলী। এ নামে আমাকে অবশ্য কেউ চেনে না। আমাকে সবাই চেনে···।'

যুবক রাসেলের চোখ দুটো অন্ধকারে যেন জ্বলে উঠল। কুঞ্চিত হলো চোখের পাতা। কিন্তু অন্ধকারে কুয়াশা কিছুই দেখতে পেল না।

রাসেল সংযত কণ্ঠে বলে উঠল কুয়াশাকে বাধা দিয়ে, 'আমি জানি। আপনার নাম কুয়াশা। আচ্ছা, বিদায়।'

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল কুয়াশা। যুবক নিজের কাঁধ থেকে কুয়াশার হাত নামিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই পা বাড়াল।

কে ছেলেটি? ভাবল কুয়াশা। তার পরিচয় জানার পরও গুরুত্ব দিল না এতটুকু!

সাত

শহীদ এবং কামাল ট্রাকের উপর উঠে পড়েছিল। দুই আহত শত্রুর বুকে বেয়োনেট চার্জ করে নেমে এল ওরা।

রাসেলকে চলে যেতে দেখে ডাকল শহীদ, 'এই যে, শুনুন।'

তরুণ রাসেল দাঁড়াল। তারপর ফিরল এদিকে। এগিয়ে আসছে সে।

কুয়াশা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। রাসেল সরাসরি কুয়াশার সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'আপনার সাথে আমার কোন শত্রুতা নেই। কিন্তু অনুমোদন করি না আপনার অ্যাকটিভিটি। দেখা করে এই কথাগুলো আপনাকে বলবার ইচ্ছে আমার ছিল। কিন্তু ভাবিনি এই রকম পরিবেশে দেখা হবে। বাঙালীর আজ মহা বিপদ। সময় নেই হাতে আজ। থাকলে যা বলবার সব বলতাম। হয়ত একদিন বলবার সময় পাব। যদি বাঁচি তবে নিশ্চয় দেখা হবে। তখন বলব।

শহীদের দিকে তাকাল রাসেল। বলল, 'আপনি আমায় ডেকেছেন?'

শহীদ বলল, 'হ্যাঁ। তোমার পরিচয়…।'

রাসেল হাসল। মৃদু হাসি, কিন্তু বড় ভরাট। সে বলল, 'আমার নাম রাসেল আহমেদ। জগন্নাথ কলেজের ছাত্র। মোড়ের ওই বাড়িটা আমাদের। দোতলার বারান্দা থেকে গুলি করেছিলাম ট্রাকের ওপর।'

শহীদ বলল, 'ড্রাইভারের মাথায় যে গুলি লেগেছে সেটা তোমার রাইফেলের। সুন্দর হাত তোমার।'

রাসেল বলল, 'ও কিছু না। কলেজে কিছুদিন থেকে প্র্যাকটিস করছি।'

শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'রাইফেলটা তোমারই?'

রাসেল বলল, 'হ্যাঁ।'

শহীদ তাকিয়ে আছে রাসেলের দিকে। কিছু যেন প্রশ্ন আছে ওর।

বুঝতে পেরেই যেন হাসল রাসেল।

বলল, 'ওই মোড়ের বাড়িটা আমাদের। আমার আম্মা এবং বোন থাকে ঢাকায়। সন্ধ্যার পর সাইকেল নিয়ে এখানে এসেছি আমি। নানারকম গজব শুনছিলাম ঢাকায়। তাই বন্ধুবান্ধবদেরকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু এখানে এসে দেখি তারা কেউ নেই। সবাই চলে গেছে ঢাকায়। সাইকেলের টায়ার ফেটে গেল বলে ফেরা হলো না ঢাকায়। গাড়িঘোড়াও পেলাম না। তাই রাতটা এখানের বাড়িতেই কাটাব ঠিক করলাম। তারপর গোলাগুলির শব্দ শুনে রাইফেল হাতে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম। ভাবিনি এখান দিয়ে কোন মিলিটারি ট্রাক পাস করবে। কিন্তু সুযোগটা পেয়ে গেলাম যখন তখন ছাড়ব কেন? ট্রাকটাই দরকার আমার, ঢাকায় যেতে হবে। আম্মা-বোন কেমন আছে জানতে চাই। ঢাকার অবস্থা খুব খারাপ বুঝতে পারছি। কিন্তু কতটা খারাপ জানতে হলে সব নিজের চোখে দেখতে হবে।

শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'তোমার আব্বা…'

রাসেল করুণভাবে হাসল।

বলল, 'আব্বা অনেকদিন আগে মারা গেছেন।'

রাসেলের চোখেমুখে ক্ষণে ক্ষণে ফুটে উঠছে অদ্ভুত এক অস্থিরতা। রাগে, দুঃখে দাঁতে দাঁত চাপছে সে। পাঞ্জাবীরা যে কত বড় অমানুষ আজ যেন সে মর্মে মর্মে টের পাচ্ছে। উচিত শিক্ষা দিতে হবে ওদেরকে। একজন একজন করে প্রতিটি দখলদার সৈন্যকে হত্যা করতে হবে।

হাত দুটো নিশপিশ করতে থাকে রাসেলের। হাতের কাছে পেলে এখনি গলা টিপে ধরবে সে কুকুর ইয়াহিয়ার।

আম্মার কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে ছোট বোন রোশেনার কথা। স্কুল-ফাইনাল দেবে এবার রোশেনা। সারারাত জেগে পড়ে। এখন কি করছে রোশেনা?

আম্মাকে পরিষ্কার দেখতে পেল রাসেল। নিঃশব্দে বসে বসে চোখের পানি

মুছছেন শাড়ির আঁচল দিয়ে। রাসেল বাড়ি নেই এই বিপদের দিনে, আম্মার আঁচল ভিজেই থাকবে চোখের পানিতে চব্বিশ ঘন্টা।

ওদের কথা মনে পড়তে হু হু করে ওঠে রাসেলের চওড়া বুকটা।

শহীদ বলে ওঠে, কি করার ইচ্ছা এখন তোমার?

'ঢাকায় যাব।'

ভারি কণ্ঠে বলে রাসেল। তারপর তাকায় শহীদের দিকে। জিজ্ঞেস করে, 'আপনাকে চেনা চেনা লাগছে…।'

শহীদ নিজের পরিচয় দিল।

রাসেল মুক্তোর মত সাদা ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসল। বলল, 'আপনাকে চিনতে না পারা আমার উচিৎ হয়নি। কাগজে আপনার সম্পর্কে লেখাগুলো আমি পড়েছি। ছবিও দেখেছি আপনার।

রাসেল হাত বাড়িয়ে দিয়েছে শহীদের দিকে।

করমর্দন করল ওরা।

অদূরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে কুয়াশা। একটু কুঁচকে উঠল তার ভুরু।

শহীদও ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে। কুয়াশার পরিচয় জানার পরও করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দেয়নি রাসেল।

শহীদ বলল, 'ঢাকায় আমরাও যেতে চাই।'

রাসেল বলল, 'ট্রাকে উঠুন তাহলে। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরছি কিছু জিনিস নিয়ে।

আট

চারিদিকে মৃত্যু। চারিদিকে ক্রন্দন। চারিদিকে হাহাকার। চারিদিকে আগুন।

অসহায় বস্তিবাসীরা গুলিবিদ্ধ হয়ে হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে মুখ থুবড়ে মরে পড়ে আছে। পিশাচ খান-সেনারা মৃতদেহের স্তূপ মাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে।

নরপিশাচদের অট্টহাসিতে চারিদিক বিষাক্ত। দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন বস্তিতে।

প্রাণভয়ে দিশেহারা লোকগুলো বস্তি থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়তে চাইছে। কিন্তু নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে ঘিরে রেখেছে পশু সেনারা। আগুনের ভয়ে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে আসছে অসহায় মেয়ে-পুরুষ, বৃদ্ধ, শিশু—অমনি গর্জে উঠছে স্টেনগান। ঢলে পড়ছে মৃত্যুর কোলে নিরীহ মানুষগুলো।

সতীত্ব রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টায় আর্ত চিৎকার করছে মায়েরা, বোনেরা, জায়ারা।

ব্যারিকেড রচনা করেছিল পাড়ার অধিবাসীরা। কামান এবং মর্টারের গোলার আঘাতে ভেঙে ফেলা হয়েছে সে ব্যারিকেড। ব্যারিকেডের আশপাশের বাড়িঘর

থেকে টেনে বের করা হয়েছে শিশু-বৃদ্ধ, যুবক এবং মেয়েদেরকে। নির্মমভাবে বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করা হয়েছে তাদেরকে। লাশগুলো রাস্তার উপর ফেলে রাখা হয়েছে। সকালে যেন শহরবাসীরা দেখে এই সব লাশ।

চারিদিকে হাহাকার। প্রাণ ভয়ে কাঁদছে শিশু। মা কাঁদছে মৃত সন্তানকে বুকে নিয়ে। কিন্তু সেই কান্নাকে ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে পশু-সেনাদের উৎকট উল্লাসধ্বনি।

ঝড়ের বেগে ছুটছে ট্রাকটা। ড্রাইভিং সীটে বসেছে কুয়াশা। পাশে শহীদ। রাসেল, কামাল এবং ডি.কস্টা ট্রাকের পিছনে।

কামাল বসে আছে। ডি.কস্টা শুয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে রাসেল ট্রাকের শেষ প্রান্তে।

'একটা জীপ আসছে।'

শহীদ আপনমনেই বলে উঠল। বহুদূরে ওর দৃষ্টি। জীপটা দ্রুত এগিয়ে আসছে।

শহীদ, কুয়াশা ও কামাল মৃত খান-সেনাদের পোশাক খুলে পরে নিয়েছে। ডি.কস্টাও চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ওর গায়ে কোনটাই ফিট করেনি।

রাসেল সাদা প্যান্ট এবং নীল শার্ট পরে আছে। পোশাক বদলায়নি সে।

শহীদ পিছন ফিরে তাকাল। রাসেল ট্রাকের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে দেখল ও! কি যেন ভাবল ও মনে মনে। তারপর বলল, 'রাসেল, বসে পড়ো। একটা জীপ আসছে। আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে পিছন ফিরে তাকালে দেখে ফেলবে তোমাকে। সিভিল ড্রেস দেখে সন্দেহ করা বিচিত্র নয়।

রাসেল শুনল। কিন্তু বসবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না তার মধ্যে।

শহীদ আবার পিছন দিকে তাকাল। তখনও রাসেল তেমনি দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ সরে এল রাসেল। কামালের সামনে এসে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'ট্রাকে যে বাক্সটা দেখলাম এখন সেটা কোথায় বলতে পারেন?'

কামাল আঙুল বাড়িয়ে এককোণে দেখাল বাক্সটা।

রাসেল প্রথমে তুলে নিল একটি স্টেনগান। তারপর সেই বাক্সটার কাছে গিয়ে নুয়ে পড়ল।

একবাক্স গ্রেনেড থেকে দুটো গ্রেনেড তুলে নিল রাসেল। একটা রাখল পকেটে। দ্বিতীয়টা রইল হাতে। স্টেনগানটা ঝুলছে কাঁধে।

আবার রাসেল ট্রাকের শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল। সামনেটা খোলা। ফেলে আসা নির্জন পথ দেখা যাচ্ছে। বিপরীত দিক থেকে আসছে উজ্জ্বল আলো। এগিয়ে আসছে জীপটা।

কান পেতে রইল রাসেল। গ্রেনেডটা তুলে ধরেছে সে মুখের সামনে। জিভ দিয়ে স্পর্শ করছে সে গ্রেনেডের পিনটা।

শোনা যাচ্ছে জীপের শব্দ। তৈরি হয়ে আছে রাসেল।

কুয়াশা ট্রাক সরিয়ে নিয়ে গেল রাস্তার একধারে। রাস্তা করে দিল জীপটাকে।

জীপটা পাশ ঘেঁষে যাচ্ছে।

রাসেল পিন খুলে ফেলল গ্রেনেডের। এক সেকেণ্ড পরই জীপটাকে দেখতে পেয়ে ছুঁড়ে দিল সে গ্রেনেড।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কানে তালা লাগার জোগাড়। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে জীপ। রাস্তার উপরই উল্টে পড়ল সেটা।

ট্রাকের গতি কমেনি। ক্রমশ দূরত্ব বাড়ছে জ্বলন্ত জীপ এবং চলন্ত ট্রাকের। শহীদ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। কুয়াশা গম্ভীর হয়ে আছে। একটা কথাও বলেনি সে রাসেলের সাথে পরিচিত হবার পর থেকে।

নয়

দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে ব্রিজটা। কুয়াশা তাকাল শহীদের দিকে। শহীদ তাকাল পিছনে।

'কি ব্যাপার?'

জিজ্ঞেস করল কামাল।

'তৈরি হয়ে নে, কামাল,' বলল শহীদ, 'সামনে মিলিটারি চেকপোস্ট বসেছে। সম্ভবত দাঁড় করাবে।

ট্রাক চালাতে চালাতেই কুয়াশা পায়ের কাছ থেকে তুলে উরুর উপর রাখল একটা স্টেনগান।

শহীদের কোলের উপর আগে থেকেই পড়ে রয়েছে একটা স্টেন।

রাসেল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ফেলে আসা পিছনের পথের দিকে।

ট্রাকের শেষ ধারে দাঁড়িয়ে আছে ও। মানুষ নয়, যেন ও একটি মর্মরমূর্তি।

লম্বা শরীরটা টান টান হয়ে আছে চোখের দৃষ্টি সামনে রেখে। কিন্তু বর্তমানের কোন দৃশ্য ও দেখছে না।

অতীতের কথা ভাবছে রাসেল। অতীতে বাঙালীরা বঞ্চিত ছিল। তাদেরকে শোষণ করা হত। সোনার লোভে, শস্যের লোভে, সম্পদের লোভে শোষককরা কখনও এই বাংলাদেশে এসেছে ডাকাত হয়ে, কখনও যোদ্ধা হয়ে, কখনও ব্যবসায়ী হয়ে।

যুগ যুগ ধরে চলছে এই শোষণ। আজও চলছে। কিন্তু আজ বাঙালীরা সচেতন হয়ে উঠেছে। আর তাদেরকে শোষণ করা চলবে না। এই সোনার দেশের অভুক্ত, নির্যাতিত বঞ্চিত সরল মানুষগুলো আজ অধিকার চায়। খেতে চায়, পরতে চায়, মানুষের মত বাঁচতে চায়।

রাসেলের চোখেমুখে ফুটে ওঠে অভূতপূর্ব এক আলো। দুর্জয় প্রতিজ্ঞায় কঠিন হয় বুক। অত্যাচারীর ধ্বংস চাই। শুধু পাঞ্জাবী সেনাদের আড়ালেই এদেশের দুঃখী

মানুষের মুক্তি আসবে না। বিদেশী আর কোন শক্তিকেই এদেশে প্রভাব খাটাতে দেয়া চলবে না। স্বদেশী পুঁজিপতিদেরকেও ঠেকিয়ে রাখতে হবে। মুক্তি চাই, এদেশের নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, বঞ্চিত দুঃখী সরল মানুষের মুক্তি চাই।

আকাশে চাঁদ নেই। দু'একটি অনুজ্জ্বল তারা মিটিমিটি জ্বলছে কেবল। দূরে দূরে গুলির শব্দ। আকাশের গুটিকতক নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে রাসেল প্রতিজ্ঞা করল এদেশকে শোষণ করার, এদেশের নিরীহ মানুষকে শোষণ করার বিরুদ্ধে লড়বে সে।

দরকার হলে প্রাণ দেবে।

শহীদের গলা শোনা গেল, 'রাসেল! বী কেয়ারফুল।'

চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকাল রাসেল। শহীদ আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু যা বোঝবার বুঝে নিয়েছে রাসেল।

একলাফে ট্রাকের কোণায় চলে গেল রাসেল। তুলে নিল কয়েকটা গ্রেনেড। দ্রুত চলে এল ট্রাকের শেষ কিনারায়।

কর্কশকণ্ঠে ঠিক সেই সময় শোনা গেল, 'স্টপ।'

উপর পানে উঠছে ট্রাক। ব্রিজের উপর গিয়ে থামল।

নিঃশব্দে নেমে পড়ল রাসেল ট্রাক থেকে নিচে। বুট জুতোর শব্দ হচ্ছে।

কান পাতল রাসেল।

চারজোড়া বুট জুতো।

দুই জোড়া দাঁড়িয়ে পড়ল।

কুয়াশার গলা শোনা যাচ্ছে: পাঞ্জাবী এম. পি.কে পাঞ্জাবী ভাষাতেই কি যেন বোঝাচ্ছে সে।

বসে পড়ল রাসেল ট্রাকের আড়ালে। দুই জোড়া বুট এগিয়ে আসছে।

অন্ধকার।

দু'জন খান-সেনা ঠিক রাসেলের দুই হাত সামনে এসে দাঁড়াল। ট্রাকের ভিতরটা দেখার চেষ্টা করছে তারা।

কামাল দাঁড়িয়ে আছে ট্রাকের কিনারায়।

দুই সেকেণ্ডের নিস্তব্ধতা। তারপর কুয়াশার চড়া কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ধমক দিচ্ছে সে পাঞ্জাবী এম. পি.কে।

আর দেরি করা যায় না। বুঝতে পারল রাসেল।

স্টেনগানের নল দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে আঘাত হানল সে পাঞ্জাবী এম. পি. দুজনার হাঁটুতে। পলকের মধ্যে ভূপাতিত হলো তারা।

রাসেল লাফ দিয়ে ট্রাকের আড়াল থেকে বেরিয়ে ডান পাশে চলে গেছে।

পরমুহূর্তে ব্রাশফায়ারের শব্দ শোনা গেল।

ধপ ধপ করে পাঞ্জাবী সেনার দুটো দেহ লুটিয়ে পড়ল। কুয়াশার সাথে ট্রাকের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তর্ক করছিল তারা।

ব্রিজের উপরই, একধারে, একটা জীপ। জীপের ভিতর দ্রুত শব্দ হচ্ছে।

গ্রেনেডের ঠাণ্ডা পিনের স্পর্শ নিল রাসেল জিভ দিয়ে।

লাফিয়ে নামল দু'জন খান-সেনা জীপ থেকে। গ্রেনেড ছুঁড়ে মারল রাসেল।

কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। আশঙ্কায় দুলতে শুরু করল বুকটা। জীপটা নষ্ট হয়ে গেল বুঝি।

কিন্তু গ্রেনেড ফাটল না।

পরমুহূর্তে শোনা গেল স্টেনের শব্দ। শহীদ সফল। লুটিয়ে পড়ল দুই শত্রু।

পিছনে এবার ব্রাশ ফায়ারের শব্দ।

বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়াল রাসেল।

ট্রাকের উপর থেকে শুয়ে শুয়ে স্টেন চালাচ্ছে কামাল।

উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিল দুই আহত শত্রু। একজন অক্কা লাভ করেছে। অপর জন শুয়ে শুয়ে স্টেনগান হাতড়াচ্ছে।

লাফিয়ে গিয়ে পড়ল রাসেল লোকটার বুকে।

ক্যাক্ করে শব্দ বের হলো লোকটার গলা থেকে।

শত্রুর বুকের উপর দাঁড়িয়ে স্টেনগানের লম্বা ব্যারেল ঠেকাল লোকটার কপালে রাসেল।

কয়েকটা বুলেট প্রবেশ করল মাথার ভিতর। শত্রুর বুক থেকে নেমে ঘুরে দাঁড়াল রাসেল।

কুয়াশা এবং শহীদ ট্রাক থেকে নেমে এগিয়ে আসছে।

রাসেল কথা বলে উঠল, 'আপনারা এত দেরি করলেন কেন? তর্ক করে কি ওদেরকে বোঝানোর দরকার ছিল?'

রাসেলের দিকে তাকিয়ে আছে কুয়াশা। হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখের চেহারা।

রাসেল এগিয়ে গেল লম্বা লম্বা পা ফেলে জীপটার দিকে।

শহীদ তাকাল কুয়াশার দিকে। কুয়াশা নিচু স্বরে বলল, 'এ ছেলে যে-সে নয়, শহীদ।'

শহীদের দুই চোখে প্রশ্ন।

কুয়াশা বলল, 'বড় দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু ওকে চিনতে পেরে যতটুকু আনন্দ পাচ্ছি তারচেয়ে দুঃখের পরিমাণ বোধহয় অনেক কম।'

'দুঃখ কেন?'

কুয়াশা হাসল।

বলল, 'বুঝতে পারছ না? রাসেল আমাকে ভাল চোখে দেখে না। প্রথম আলাপেই পরিষ্কার বুঝেছি আমি।'

শহীদ একটু যেন হাসল।

বলল, 'আর আনন্দ হচ্ছে কেন?'

কুয়াশা বলল, 'এমন একটি ছেলের সন্ধানে অনেকদিন থেকেই ছিলাম আমি। এক দেখেছিলাম তোমাকে। বুদ্ধি, সাহস, প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব ছিল তোমার মধ্যে। তাই দেখেই আকৃষ্ট হয়েছিলাম আমি। তারপর আর কাউকে পাইনি। আজ পেলাম রাসেলকে। তুমি দেখো, শহীদ, রাসেল একদিন বিরাট মানুষ হবে। তোমার আমার চেয়েও বড় হবে ও।

জীপ থেকে রাসেলের গলা শোনা গেল, 'শহীদ ভাই, আমি জীপ নিয়ে যাচ্ছি।'

শহীদ বলল, 'একা?'

'ভয় নেই। আপনারা পিছু পিছু আসুন। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঢাকায় পৌঁছুতে চাই।'

আম্মা এবং বোনের মুখ ভেসে উঠল মানসপটে। স্টার্ট দিল রাসেল জীপে। চোখ ভরা জল ওর। কার উদ্দেশ্যে যেন দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল ও। চলতে শুরু করল জীপ।

দশ

সত্যি কথা বলতে কি, সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে রাসেল।

শুধু একটি ব্যাপারেই নয়, সব ব্যাপারেই। ওই তো বয়স, কিন্তু যে কোন গাড়ি চালনাতেও সে অভিজ্ঞ। আগে তার জীপ, যেটায় সে একা। অন্যটা পিছনে। তাতে কুয়াশা, শহীদ এবং কামাল। তাছাড়া অচেতন ডি.কস্টাও রইল। কখন যেন সে জ্ঞান হাড়িয়েছে।

ডি.কস্টার জ্ঞান অবশ্য ফিরিয়ে আনল কামাল কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

জ্ঞান ফিরে পেয়েই ডি.কস্টা প্রলাপ বকার মত বলতে লাগল, 'বী কেয়ারফুল, মিস্টার! আমি নেটেভ নেহি আছি। অ্যাই অ্যাম অ্যান ইংলিশম্যান। ডোন্ট টাচ মি ইউ! টোমাডের সাটে আমার কোন গুলমাল নেই, মিস্টার!'

কামালের হাসি পেল এমন পরিস্থিতিতেও। খান-সেনাদের হাতে ধরা পড়লে ডি.কস্টা কেমন আচরণ করবে তা সে জানতে পারল পরিষ্কার।

শহরের দিকে এগিয়ে চলেছে ট্রাক। শহরের ভিতর ঢোকার পরপরই সতর্ক হয়ে গেছে কুয়াশা। বর্বর সেনাদের দক্ষযজ্ঞ কাণ্ডের কোন সীমা পরিসীমা নেই। বস্তিগুলো আগুন জ্বলছে এখনও।

ঘড়ি দেখল শহীদ।

রাত আড়াইটা।

সাড়ে এগারোটা থেকে আড়াইটা! এখনও চলছে একইভাবে অবিরাম গোলাগুলি বর্ষণ।

দিকে দিকে জ্বলে উঠেছে আগুন।

এ আগুন নিভবে না।
রাস্তায় রাস্তায় স্তূপিকৃত হয়ে রয়েছে রক্তাক্ত মৃতদেহ। ব্যারিকেড ভেঙে ফেলা হয়েছে।
তবে সংঘর্ষ বন্ধ হয়নি। বাঙালী পুলিসরা হাল ছাড়েনি এখনও।
শহরে ঢুকে চমকে উঠল কুয়াশা। বর্বর সেনারা শহরটাকে কি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে চায়? ঢাকাবাসীদেরকে কি হত্যা করবে তারা গুণে গুণে?
হঠাৎ রাসেলের কথা মনে পড়তেই সামনের দিকে তাকাল কুয়াশা।
সামনে কোন জীপ নেই।
নির্জন প্রায় রাস্তা। অন্ধকার বললেই চলে। চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে রাস্তার পাশে মৃতদেহ। মাঝেমধ্যে উজ্জ্বল হেডলাইট জ্বেলে সামনের দিক থেকে তীর বেগে ছুটে আসছে বর্বর সেনাদের ভ্যান বা জীপ।
অ্যারোড্রোমের কাছে কয়েকটা ট্যাঙ্ক দেখতে পেল ওরা।
নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালীকে দাবিয়ে রাখার জন্যে পশুরা ট্যাঙ্ক ব্যবহার করছে এ যেন দেখেও বিশ্বাস করা সহজ নয়।
রাস্তায় কেউ বাধা দিল না ওদের ট্রাককে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ট্রাক, বাধা দেবার কথাও নয়।
ষাট মাইল বেগে যন্ত্রদানব ছুটে চলেছে।
'রাসেলের জীপটা দেখা যাচ্ছে না।'
'কুয়াশা বলল একসময়।'
শহীদ বলে উঠল, 'অনেক আগেই সেটা অদৃশ্য হয়ে গেছে সামনের দিকে।'
কামাল বলে উঠল, 'বড় বেপরোয়া। এ ছেলে বাঁচবে বলে মনে হয় না।'
কামালের কথার উত্তর দিল না কেউ। কিন্তু কেউ উত্তর না দিলেও সৃষ্টিকর্তা বুঝি কামালের মন্তব্যে মুচকি একটু হাসলেন।
ধানমণ্ডি এলাকায় পৌঁছে কুয়াশা ট্রাকের স্পীড কমাল।
পাঁচ নম্বর রোডের মাথায় একটা জীপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুখ চাওয়া চাওয়ি করল ওরা তিনজন। দাঁড়ানো জীপটার নম্বর প্লেট দেখেই চিনে নিয়েছে ওরা। এই জীপই চালাচ্ছিল রাসেল।
পাশ কাটিয়ে রোডের ভিতরে ঢোকার সময় ওরা দেখল জীপের ভিতর কেউ নেই।
খানিকটা আরও এগোবার পর শহীদের বাড়িটা দেখা গেল।
ধড়াস করে উঠল শহীদরে বুক। বাড়ির সামনে একটা জীপ দাঁড়িয়ে আছে। মহুয়া এবং লীনার কথা ভেবে শিউরে উঠল শহীদ।
কুয়াশারও মুখভাব কঠিন আকার ধারণ করেছে।
জীপটার পিছনে বাড়ির কাছেই ট্রাক থামাল কুয়াশা।

ওদের প্রত্যেকের পরনে পাঞ্জাবী সেনার পোশাক। প্রত্যেকের হাতেই স্টেনগান।

প্রথমে নামল শহীদ। অপর দরজা দিয়ে নামল কুয়াশা। কামাল নামল শহীদের পিছু পিছু।

জীপের ভিতরে কেউ নেই।

বাড়ির গেট খোলা। দোতলার বারান্দায় আলো জ্বলছে।

বারান্দায় জীবিত কেউ নেই। কিন্তু গফুরের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে রক্তাক্ত অবস্থায়। গফুরের পাশেই দু'জন শত্রুর লাশ। লড়ে মরেছে গফুর। দাঁতে দাঁত চাপল শহীদ সকলের অজ্ঞাতে।

উঠানটা অল্প আলোয় আলোকিত। সেই আলোয় তিনজন পাঞ্জাবী সেনাকে দেখতে পেল ওরা। নিচতলার বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এগিয়ে আসছে তিনজন।

শহীদের পোশাক দেখে সশব্দে স্যালুট মারল তিনজন।

শহীদ কৃত্রিম কঠোর স্বরে পাঞ্জাবী ভাষায় বলল, 'তোমরা কার কমাণ্ডে আছ?'

'ক্যাপ্টেন আনসারী, স্যার।'

শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কেন এসেছ?'

পাঞ্জাবী সেনাদের একজন বলল, 'ক্যাপ্টেন নিয়ে এসেছেন, স্যার।'

আর একজন বলল, 'ডাকব, স্যার?'

'না। দোতলায় আছে ও?'

'ইয়েস, স্যার।'

শহীদ কুয়াশা এবং কামালের দিকে ফিরে পাঞ্জাবীতে বলল, 'তোমরা এসো আমার সাথে।'

কথাটা বলেই হঠাৎ কি মনে করে পাঞ্জাবী সেনাগুলোর দিকে ফিরে তাকাল ও। বলল, 'তোমরা নিজেদের গাড়িতে যাও।'

পাঞ্জাবী সেনারা বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতেই ওরা তিনজন শুনতে পেল মহুয়ার চিৎকার, 'খবরদার, আর এক পা-ও সামনে এগিয়ো না বলছি! আমরা মেয়ে হতে পারি! কিন্তু দুর্বল নই। আমাদের মান-ইজ্জত রক্ষা…।' মহুয়ার কথা শেষ হলো না, শোনা গেল লীনার তীব্র চিৎকার, 'বাঁচাও! বাঁচাও!'

এগারো

ছুটে যাবারও উপায় নেই। বুট জুতোর শব্দে সন্দিহান হয়ে উঠবে শত্রু।

নিঃশব্দ পায়ে সিঁড়ি ভেঙে উপরের বারান্দায় উঠে এলো ওরা।

চিৎকারটা আসছে বারান্দার শেষ প্রান্তের কামরা থেকে।

শহীদ এবং কুয়াশা আগে আগে, পিছনে কামাল।

লীনা অবিরাম চিৎকার করছে। মাঝে মাঝে গলা শোনা যাচ্ছে মহুয়ার।

কামরাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল শহীদ। তার পাশেই কুয়াশা।

'খবরদার!' হুঙ্কার দিল শহীদ।

কামরার ভিতর নেমে এল নিস্তব্ধতা। লীনাকে ছেড়ে দিল পাঞ্জাবী এক পিশাচ। অপর পিশাচ মহুয়ার শাড়ির আঁচল ছাড়ল না, শুধু কঠিন দৃষ্টিতে ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকাল।

উদ্যত স্টেনগান নিয়ে কামরার ভিতর পা দিল শহীদ এবং কুয়াশা। কামালও ঢুকল, কিন্তু চৌকাঠের উপর দাঁড়াবার জায়গা পেল ও।

লীনার পরনে শুধুমাত্র ব্লাউজ আর পেটিকোট। বর্বর পশুরা তার শাড়ি কেড়ে নিয়েছে। আর একটু দেরি হলে লজ্জা এবং মান-ইজ্জত থাকত না।

শহীদ দুই বর্বরের দিকে তাকাল। আগুন ঝরছে ওর দুই চোখে।

শহীদের কাঁধের ব্যাজ দেখেও সন্দেহ দূর হলো না একটা পিশাচের। মহুয়ার শাড়ি ছেড়ে দিয়ে পরিপূর্ণ ভাবে ঘুরে দাঁড়াল সে শহীদের দিকে মুখ করে।

শহীদ কঠিন কণ্ঠে বলল, 'খবরদার! এক পাও নড়বে না। হাত তোল মাথার উপর।'

'তুমলোগ হাথ উঠাও শির কা উপ্পর। বদমাশ, কাফের কাঁহিকে।' পিছন থেকে বলে উঠল কর্কশ কণ্ঠস্বর।

চমকে উঠল ওরা তিনজন।

শহীদ কুয়াশা এবং কামালের পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এসেছে নিচের তিন খান-সেনা।

শহীদদেরকে দেখে ওদের মনে সন্দেহ হয়। সন্দেহবশত নিঃশব্দে উপরে উঠে এসেছে শয়তানগুলো।

'হাতিয়ার ডালো।' পিছন থেকে হুকুম পেল শহীদ, কুয়াশা, কামাল।

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে খপ করে ধরে ফেলল কামরার ভিতর এক পশু লীনার একটা হাত।

অপর পশুটি এগিয়ে গেল মহুয়ার দিকে। মহুয়া জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলে উঠল, 'ওরে শয়তান, তোর লজ্জা-শরম ভয় ভীতি কিছুই নেই। সাবধান…।'

চিৎকার করে উঠল লীনা, 'কামালদা, দাদা…।'

হেসে উঠল কামরার ভিতর দুই সাক্ষাৎ শয়তান। পরমুহূর্তে শোনা গেল অপ্রত্যাশিত স্টেনগানের ব্রাশ ফায়ারের শব্দ।

ওরা যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। শহীদ কেবল আড়চোখে একবার তাকাল কুয়াশার দিকে। কুয়াশার দৃষ্টি কামরার ভিতরই নিবদ্ধ। দুই পিশাচ আবার লীনা এবং মহুয়াকে ছেড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

অকস্মাৎ কামাল, শহীদ এবং কুয়াশাকে ধাক্কা দিয়ে কামরার ভিতর প্রবেশ করল রাসেল।

'মহিলারা বসে পড়ুন!' চিৎকার করে উঠল রাসেল।

লীনা এবং মহুয়া যন্ত্রচালিতের মতই বসে পড়ল মেঝেতে।

দুই পিশাচ অকস্মাৎ হাত দিল কোমরে অস্ত্র নেবার জন্যে।

গর্জে উঠল রাসেলের স্টেনগান আর একবার।

ঝাঁঝরা হয়ে গেল দুই বর্বর সেনার বুক। নরকে চলে গেল তারা মুহূর্তের মধ্যে।

রাসেল ঘুরে দাঁড়াল শহীদ এবং কুয়াশার দিকে। বলল, 'দেরি করা উচিত হয়নি আপনারদের। কামরায় ঢুকেই গুলি করেননি কেন?'

শহীদ রাসেলের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু তুমি হঠাৎ এলে কোথা থেকে? বাড়িটাই বা চিনলে…!'

রাসেল বলল, 'আপনি গুণী লোক, আপনার বাড়ি চিনব না তো চিনব কার! জীপ নিয়ে আসিনি। দূর থেকেই দেখেছিলাম জীপটা দাঁড়িয়ে আছে এ বাড়ির সামনে। চুপিসাড়ে আপনার পাশের বাড়ির ভিতর ঢুকে ছাদে উঠে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে আপনাদের তিনতলার ছাদে চলে আসি। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামি দোতলায়। নেমেই দেখি আপনারা বিপদে পড়েছেন। সময় নষ্ট না করে তিন শয়তানকেই নরকে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

কামাল বলল, 'তুমি যদি সময় মত…।'

রাসেল বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'সে-কথা থাক! এখানে আর এক মুহূর্ত থাকা নয়। বাড়ি ত্যাগ করে পালাতে হবে।'

কামাল বলল, 'কিন্তু এই অবস্থায় মেয়েদেরকে নিয়ে বাড়ি ত্যাগ করে যাব কোথায়?'

রাসেল বলল, 'বাড়ি ত্যাগ তো করতেই হবে, এমনকি এই শহর, এ দেশও ত্যাগ করতে হতে পারে। আপনারা পাঞ্জাবী পশুদের নৃশংসতা টের পাননি নাকি এখনও!'

মহুয়া বলে উঠল, 'শহীদ, আমি আর এক সেকেণ্ডও থাকতে চাই না এখানে। শয়তানগুলো তোমাকে খুন করতে এসেছিল। তোমাকে না পেয়ে আমাকে আর লীনাকে…।'

রাসেল বলল, 'আপনারা বরং পরে আলাপ করবেন। এখুনি বেরিয়ে পড়া উচিত।'

মহুয়া সমর্থন করে বলল, 'হ্যাঁ। আর একদল কুকুর হয়ত এখুনি এসে পড়বে।'

লীনা অপর এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে কামরা থেকে। মহুয়াও কামরা ত্যাগ করতে করতে বলল, 'আমি লীনাকে নিয়ে আসছি এখুনি।'

কথাটা আর কারও মনে না থাকলেও কুয়াশার মনে ছিল। রাসেলের দিকে

তাকিয়ে সন্দেহ জাগল মনে। কেমন যেন বেপরোয়া হয়ে উঠছে ছেলেটা আরও। বুকের অন্তস্তল থেকে কেমন যেন উথলে উঠল অসীম স্নেহ।

'রাসেল!' মৃদু স্বরে ডাকল কুয়াশা।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রাসেল।

'তোমার আম্মা, বোন…।'

রাসেল ঘুরে দাঁড়াল এবার। কুয়াশার দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। বলল, 'জিজ্ঞেস করার জন্যে ধন্যবাদ। আমি বাড়ি হয়েই এখানে এসেছি।'

'খবর ভাল তো?' জিজ্ঞেস করল শহীদ।

রাসেল নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে। হাসতে চাইছে ও।

হতবাক হয়ে সবাই তাকিয়ে রইল রাসেলের দিকে। রাসেল প্রাণপণ চেষ্টা করছে হাসতে। কিন্তু কাঁপছে ওর ঠোঁট জোড়া।

হঠাৎ মাথা নামিয়ে নিচের দিকে তাকাল রাসেল। ঠোঁট জোড়া স্থির হলো। দুই ফোঁটা তপ্ত পানি ঝরে পড়ল চোখ থেকে।

মাথা তুলল রাসেল। মুখের চেহারা অন্যরকম দেখাচ্ছে এখন। মৃদু একটু হাসি ঠোঁটে।

বলল, 'খবর ভাল কি খারাপ ঠিক বুঝতে পারছি না এই মুহূর্তে। তবে আম্মাকে হারিয়েছি, যাকে হারালে আর পাওয়া যায় না। বোনকেও হারিয়েছি। বাড়িতে ঢুকে খুন করে গেছে ওরা! এ হয়ত ভালই হয়েছে। আমার আর কোন বন্ধন রইল না। আমি মুক্ত।'

তাকিয়ে রইল সবাই। কারও মুখে কোন কথা নেই।।

বারো

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দ্রুত একটি অ্যাটাচী কেসে ভরে নিল শহীদ এবং কামাল। মহুয়া ও লীনা গহনা এবং টাকা পয়সা নিয়ে নচে নেমে আসতেই কুয়াশা বলল, 'শহীদ, এবার আমাদের ছাড়াছাড়ি হোক।'

শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যেতে চাও তুমি?'

কুয়াশা হাসল। বড় রহস্যময় সে হাসি। এ হাসির অর্থ জানে শহীদ। তবু সে চুপ করে রইল উত্তরের অপেক্ষায়।

কুয়াশা বলল, 'যাবার জায়গা অনেক, শহীদ।'

কুয়াশার কথা শেষ হতেই রাসেল বলে উঠল, 'মি. কুয়াশা, আপনাকে বলবার একটা কথা আমার আছে। আশা করি বিরূপ হবেন না। দেশের ও দশের মঙ্গলের নাম করে এতদিন আপনি যা করে এসেছেন তা এককথায় ক্রাইম। তাই বলছি দশের উপকারের নাম করে আপনার পক্ষে খান-সেনাদের সাথে হাত মেলানোও বিচিত্র নয়। কিন্তু আপনার কাজকে আমি ঘৃণা করলেও আপনাকে আমি ঘৃণা করি না।

আপনাকে আমি ঘৃণা করি না বলেই একটা অনুরোধ রাখতে চাই বিদায়ের আগে। দেশের এই চরম বিপদে আমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমরা কে কোথায় ছিটকে পড়ব জানি না। হয়ত এ-জীবনে আমাদের আর দেখা হবে না। তবু, আমার অনুরোধ আমি রাখছি। আপনি তা মানবেন না হয়ত, তবু।'

কুয়াশার দুই চোখে কৌতুকের ছটা! রাসেল নামক এই অদ্ভুত যুবকটির ওপর তার চটে ওঠার যথেষ্ট কারণ আছে কিন্তু মনে মনে সে বরং স্নেহ করতেই শুরু করেছে তাকে। সে বলল, 'বলো, রাসেল। তোমার অনুরোধটি কি।'

'আর যাই করুন, দেশের সাথে, দেশের মাটির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। তার ফল ভাল হবে না।'

অনেক আগেই দাগ কেটেছে কুয়াশার মনে রাসেল।

কুয়াশা হাসিমুখেই জিজ্ঞেস করল, 'ফল ভাল হবে না কথাটার মানে?'

এবার মুক্তোর মত সাদা ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসল রাসেল।

বলল, 'আপনি আজ অবধি যতগুলো কাজ করেছেন তার প্রতিটির মধ্যে ছিল মারাত্মক ত্রুটি। আজ সময় বড় কম হাতে, তা নাহলে ত্রুটিগুলো উল্লেখ করতে পারতাম। আমার এ কথা বলার কারণ এই যে আপনি কোন অপরাধ করার সময় ত্রুটিহীনভাবে করতে পারেন না। ভুল পদ্ধতি, ভুল চিন্তার ফলে আপনি অনেক অকারণ ঝামেলা বাড়িয়েছেন, বিপদে পড়ার আশঙ্কা বাড়িয়েছেন, বিপদে পড়েছেনও। তাই বলছি, দেশের বিরুদ্ধে আবার কোন অপরাধ করতে গেলে ফল ভাল হবে না। কেন না মারাত্মক ভুল আপনি করবেনই।'

কুয়াশা এবার গম্ভীর হলো। যুবকের আত্মবিশ্বাস এবং অহঙ্কার কম নয়। কুয়াশার ভুল ধরছে সে!

কুয়াশা হঠাৎ আবার হাসল। বলল, 'আমি জানি আবার আমাদের দেখা হবে। তখন তোমার কাছ থেকে আমার ভুল-ত্রুটিগুলো জেনে নেব। আর, কথা দিচ্ছি তোমাদের, দেশের চেয়ে প্রিয় আমার কাছে আর কিছু নেই, হবেও না।'

আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা দিল রাসেলের চোখেমুখে। নিষ্পলক তাকিয়ে রইল সে কুয়াশার দিকে। অনেকক্ষণ পর সে কেবল বলল, 'আশাকরি আপনার কথা আপনি রক্ষা করবেন।'

'যে অবিশ্বাস করে তাকে বিশ্বাস করানো কঠিন। তুমি আমাকে আগাগোড়া অবিশ্বাস করো।'

'তা করি।' স্পষ্ট ভাষায় বলল রাসেল।

কুয়াশা মুচকি হাসল। তারপর মহুয়ার দিকে ফিরে বলল, 'চলি, বোন।'

'চললে, দাদা? কিন্তু আমাদের কি আর দেখা হবে না?'

মহুয়ার দুই গাল বেয়ে নেমে এল জলের ধারা।

হাসল কুয়াশা। মহুয়ার কাঁধে ভারি হাতটা রেখে সে বলল, 'পাগলী! দেখা হবে না কেন রে! একশোবার দেখা হবে। লীনা, চলি। কামাল, যাই হে। শহীদ, চললাম। আর রাসেল, তোমাকে আশীর্বাদ করি, তুমি দেশের মুখ উজ্জ্বল কোরো। বড় হও আমার চেয়ে অনেক বড় হও। বিদায়, ভাই।'

'আপনার কথা যেন অক্ষরে অক্ষরে ফলে। বিদায়।'

রাসেলের গলায় ব্যঙ্গের সূক্ষ্ম আভাস পেয়েও কুয়াশা বিচলিত হলো না। ঘুরে দাঁড়াল সে। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে বড় রাস্তার দিকে।

দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল কুয়াশা।

শহীদ চোখ ফিরিয়ে তাকাল রাসেলের দিকে। রাসেল সাথে সাথে জানতে চাইল, 'আমাকে আপনারা সঙ্গে নেবেন তো, শহীদ ভাই?'

বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল শহীদ। কেন, কে জানে। বলল, 'নেব বৈকি, ভাই।'

রাসেল মহা উৎসাহে বলল, 'তাহলে আর দেরি নয়।'

কথাটা বলেই প্রকাণ্ড এক লাফ মেরে ট্রাকের পিছনে উঠে দাঁড়াল সে। হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আসুন, আমার হাত ধরে উঠে আসুন, মহুয়াদি।'

মহুয়া অবাক বিস্ময়ে তাকিয়েছিল এতক্ষণ রাসেলের দিকে। সরল, নিষ্পাপ দুই চোখবিশিষ্ট কে এই যুবক। মহুয়াদি ডাকটি তার কী মধুর। হৃদয় যেন ভরে উঠল এই এক ডাকেই।

অসঙ্কোচে হাতটা ধরল মহুয়া।

মহুয়া ট্রাকের উপর উঠল।

রাসেল বলল, 'লীনা, বোন, এবার তুমি এসো।'

এগিয়ে গেল লীনা।

কামালের ঠোঁটে একটু হাসি ফুটল। লীনা দ্বিধা করছিল। নিঃশব্দে ইঙ্গিত করল কামাল। মৃদু হেসে রাসেলের বাড়ানো হাতটা ধরল লীনা।

তেরো

সে রাত্রির কথা বুঝি এ জীবনে ওরা কেউ ভুলতে পারবে না। মানুষ যে কত অসহায় তা ওরা এর আগে বুঝি ভাবেনি। গুলি খাচ্ছে, নিশঃব্দে লুটিয়ে পড়ছে মৃত্যুর কোলে। পাশে দাঁড়ানো লোকটি সব দেখেও পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। নড়বার কোন লক্ষণ নেই তার মধ্যে। নড়বে, নড়ে যাবেই বা কোথায়? এ যে তারই ঘর, লাশগুলো যে তারই মা-বাপ-ভাই-বোন-স্ত্রীর। এদেরকে ফেলে, এই ঘর ত্যাগ করে কোথায় যাবে সে? আত্মরক্ষার উপায় তো নেই। এলাকা ঘিরে ফেলেছে দলে দলে মূর্তিমান শয়তানের দল। ঘরে ঘরে ঢুকছে তারা। ঢুকে খুন করছে।

ওরা শুধু অসহায় মানুষদেরকেই দেখল না। সেই সাথে দেখল আর একদল

মানুষ কি ভীষণ নিষ্ঠুর হতে পারে, কি ভীষণ অমানুষ হতে পারে। মায়ের কোল খেকে কেড়ে নিয়ে শিশুকে আছাড় মারল দেয়ালের সাথে। নিষ্পাপ শিশু খিলখিল করে হাসছিল। অকস্মাৎ চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল তার সেই মিষ্টি ঝরঝরে হাসি। বেয়োনেট দিয়ে বিদ্ধ করা হল যুবতী কন্যার বুক, তার বাবার সামনে। স্বামীর সামনে পাশবিক অত্যাচার চালাল নরপিশাচরা স্ত্রীর উপর।

রক্তের বন্যা সদরঘাট টার্মিনালে। রক্তের স্রোত শাখারী বাজারে। প্রতিটি রাস্তায় স্তূপীকৃত লাশ।

ঢাকা ত্যাগ করে বহুদূর চলে যাবার ইচ্ছা ছিল শহীদের। কিন্তু ঢাকার নবাববাড়ির ভিতর দিয়ে নদীর ঘাটে যাবার পরামর্শ দিল রাসেল। তার ধারণা ঢাকা ত্যাগ করার সময় এখনও আসেনি। বলা যায় না, সকাল হবার পর অন্যরকম খবর পাওয়া যেতে পারে। চারদিকে বর্বরদের বর্বর আচরণের স্বাক্ষর পরিস্ফুট হয়ে দেখা গেলেও বাঙালী পুলিস এবং বাঙালী সেনারা চুপ করে নেই। তারা লড়ছে, বাধা দিচ্ছে। সকাল হবার আগে প্রকৃত অবস্থা বোঝা যাবে না। অবস্থা যদি বাঙালীদের অনুকূলে থাকে তাহলে নিরস্ত্র বাঙালীরা সাহসে বুক বেঁধে শত্রুসংহারে নামতে দ্বিধা করবে না। সে সময় দরকার বুদ্ধিমান লোকের। রাসেল তাই শহীদকে ঢাকা ত্যাগ করতে দিতে চাইল না।

শহীদ অবশ্য ঢাকা ত্যাগ করতেও চায়নি। সে চেয়েছিল মহুয়া এবং লীনাকে ঢাকার বাইরে রেখে রাতারাতি আবার ফিরে আসতে। ফিরে এসে রীতিমত সংঘর্ষে লিপ্ত হবার ইচ্ছাই ছিল তার। কিন্তু রাসেল তাতেও রাজি হতে পারল না।

সে বলল, 'অবস্থা কেমন তা না জেনে এই মুহূর্তে আপনার কিছুই করা উচিত নয়, শহীদ ভাই। এভাবে কোমর বেঁধে নেমে পড়াটা উচিৎ হবে না। সব খবর আগে পাওয়া দরকার। শত্রুর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা কোথায় তা আগে জানা দরকার। তারপরই সেখানে আঘাত হানা যেতে পারে। দ্রুততা বা ভাবাবেগবশত কিছু একটা করতে গিয়ে যদি প্রাণ হারান তাহলে দেশ মাতৃকার জন্যে প্রাণ দিয়ে আপনি শহীদ হবেন বটে কিন্তু দেশের তাতে খুব একটা উপকার হবে না।'

নদীর ঘাটে নৌকা ছিল। কিন্তু জনমনিষ্যির কোন চিহ্ন ছিল না।

অন্ধকার নদী।

নদীর এপার থেকে গুলি করা হচ্ছে নদীর ওপারের গ্রামগুলোকে লক্ষ্য করে। তবে শহীদদের কাছ থেকে প্রায় আধামাইল বাঁয়ে শত্রুপক্ষ।

নৌকা করে অন্ধকার নদীতে ভাসল ওরা।

এই যে ভাসল, এই ভাসার বুঝি শেষ নেই, সীমা নেই।

নদীর ওপার থেকে জিঞ্জিরা বাজার। সেখানে ক'দিন পর হানা দিল দখলদারবাহিনী। সেখান থেকে জনস্রোতে মিশে গিয়ে ভেসে চলল মহুয়া এবং লীনা।

শহীদ, কামাল এবং রাসেল তখন ঢাকায়। কিন্তু খুব বেশি দিন ওরা থাকতে

পারল না ঢাকায়। কাজ করা দরকার। দুচোখ মেলে অনেক বর্বরতা, অনেক নৃশংসতা দেখল ওরা। কিন্তু দেখে কি লাভ, প্রতিশোধ তো নিতে হবে। আর প্রতিশোধ নিতে হলে ঢাকায় বসে থাকলে চলবে না।

এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় ঢাকা ত্যাগ করল ওরা।

বুড়ীগঙ্গার ওপারে বর্বর সেনাদের তাণ্ডব লীলার পর মহুয়া এবং লীনার কোন সঠিক খবর পায়নি শহীদ।

পথে পরিচিত লোকদের সাথে দেখা হয়েছে। পরিষ্কার করে কেউ কিছু বলতে পারেনি। ঢাকায় যে-কদিন ছিল শহীদ সে-কদিন এত বেশি ব্যস্ত ছিল যে মহুয়া এবং লীনার কোন খবর নেবার সুযোগই সে পায়নি।

স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিস অফিসার মি. সিম্পসনের সাথে গোপনে দেখা করেছে শহীদ। ওর সঙ্গে রাসেল এবং কামালও ছিল।

মি. সিম্পসনকে রাসেলই প্রস্তাব দেয় ঢাকা ত্যাগ করে মুক্ত এলাকায় চলে যাবার। কিন্তু মি. সিম্পসন তাতে রাজি হননি। রাজি না হবার কারণও ছিল। সে কারণ শোনার পর রাসেল তার প্রস্তাবের পক্ষে আর কোন কথা বলেনি।

মি. সিম্পসন বললেন, 'আমার অধীনে যারা চাকরি করে তাদের ওপর আমার একটা দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব পালন করব আমি। তারপর মুক্তাঞ্চলে যাব।'

এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় রাসেল বলল, 'শহীদ ভাই, এভাবে বসে থাকতে আমার আর ভাল লাগছে না। ইচ্ছে করছে এমন অসম্ভব একটা কিছু করি যার ফলে রাতারাতি স্বাধীন হয়ে যাক দেশ। কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয়। চলুন, আগে যুদ্ধ করাটা শিখে ফেলি।'

এপ্রিলের শেষ দিকে মুক্ত অঞ্চলে পৌঁছাল ওরা। মুক্ত অঞ্চলে পৌঁছেও কিন্তু ওরা মহুয়া এবং লীনার কোন সন্ধান পেল না। রাসেল চেষ্টা করেছিল কুয়াশার খবর সংগ্রহ করার। কিন্তু মুক্ত অঞ্চলের মানুষরা কুয়াশার কোন খবর ওকে দিতে পারল না।

এদিকে মহুয়া এবং লীনার জন্যে শহীদ চিন্তিত হলেও ওরা নিজেদের প্রাণের জন্যে মোটেই ভাবিত না।

অভিজ্ঞতা মানুষকে খাঁটি করে। কঠোর অভিজ্ঞতার আগুনে পুড়ে একদিনেই মহুয়া এবং লীনা হয়ে উঠেছে খাঁটি মানবদরদী।

জিঞ্জিরায় যে বিপদে ওরা পড়েছিল এপ্রিলের দু'তারিখে, সে-বিপদ থেকে খোদা নিজে ওদেরকে বাঁচিয়েছেন বলাই ঠিক।

অন্ধকার তখনও দূর হয়নি। ঘুম থেকে তখনও গ্রামবাসীরা জাগেনি।

শুধু জেগেছিল বিরাট এক দল নরপিশাচ বুকে রক্ত পিপাসা নিয়ে নদীর ওপারে।

নৌকোর পর নৌকো রেখে, টেমপোরারি ব্রিজ তৈরি করে ট্যাঙ্ক নিয়ে এল শয়তানের দল সদরঘাট টার্মিনাল থেকে।

ওদিকে ধলেশ্বরী পেরিয়ে ডান দিক থেকে এবং নবাব বাড়ির পাঁচ মাইল বাঁ দিকে

সরে গিয়ে আরও দুটি বিরাট শত্রুবাহিনী নদী পেরিয়ে গোটা জিঞ্জিরা ঘিরে ফেলল।

অন্ধকার ফিকে হয়ে আসার সাথে সাথে গর্জে উঠল ট্যাঙ্ক, মর্টার, রকেট।

ত্রিমুখী আক্রমণে নিরস্ত্র ঘর-সংসারী মানুষগুলো মৃত্যু অবধারিত জেনেও স্ত্রী-পুত্র কন্যার হাত ধরে সেই আধো অন্ধকারে ঘর ছেড়ে মাঠে নেমে প্রাণপণে দৌড়াতে শুরু করল।

কিন্তু কোন দিকে যাবে তারা?

ছুটছে মানুষ। চারদিকে আর্ত চিৎকার। আকাশ বাতাস চিরে ফেটে পড়ল ট্যাঙ্কের গোলার শব্দ।

পিপঁড়ের মত মরল মানুষ।

মহুয়া এবং লীনা আশ্রয় নিয়েছিল শহীদের এক বন্ধুর বাড়িতে। বন্ধু ভদ্রলোকটি বাড়ি ছিল না কদিন থেকেই। বন্ধুর স্ত্রী এবং বৃদ্ধ বাবা ছাড়া আর কেউ ছিলেন না।

গোলাগুলির শব্দের পরই গ্রামবাসীরা বেরিয়ে পড়েছে যে যার ঘর থেকে। চারদিকে কলমা আর দোয়া দরূদের কণ্ঠস্বর! কিন্তু সেই সব কণ্ঠস্বরকে চেপে দিয়ে শোনা যেতে লাগল বুলেটের শব্দ।

অন্ধকারে ছুটছে মানুষ। মহুয়া এবং লীনা বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে।

মেঠো পথের পাশেই মাঠ, ধান খেত। বাইরে বেরিয়েই ওরা দেখল দূরে আগুন এবং ধোঁয়ার রাশি।

আগুন জ্বালাতে জ্বালাতে ছুটে আসছে দলে দলে যমদূত।

দলে দলে ছুটছে মানুষ! হাজারও কণ্ঠের আহাজারীতে কান পাতা দায়। মাঠে, খেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে মানুষ, গুলিবিদ্ধ হয়ে। কে পড়ল কে মারল কে তার খবর রাখে। প্রাণে বাঁচতে হবে। থামলে চলবে না ছুটতে হবে।

মহুয়া এবং লীনার পাশ দিয়েই বাচ্চা ছেলে মেয়ের হাত ধরে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে দলে দলে মানুষ।

শিশুরা পিছিয়ে পড়ছে। পিছিয়ে পড়ছে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা। সকলের গলাতেই কান্না।

চোখ ফেটে জল আসে মহুয়ার। একি নারকীয় তাণ্ডব। মানুষের কি কোনই মূল্য নেই? তারা কি কুকুর বেড়ালের চেয়েও অধম। কি করেছিল তারা?

মায়ের কোল থেকে শিশুটি পড়ে গেল অকস্মাৎ মহুয়ার পায়ের সামনেই। ছুটতে ছুটতে শিশুর মা হঠাৎ চিৎকার করে কেঁদে উঠল। তার বুকের দুটো শিশুর মধ্যে একটা নেই।

'আমার সোনা-মানিক কই পড়ল?'

মহুয়ার কথা চাপা পড়ে গেল অদূরবর্তী কামানের গর্জনে।

মা আর এক পাও এগোতে চাইছে না। কিন্তু তার স্বামী শক্ত হাতে ধরেছে স্ত্রীর একটা হাত। স্বামীর কণ্ঠে আতঙ্ক।

সে বলছে, 'সোনার মা, থাউক তোমার সোনা, সোনা তুমি আবার পাইবা, কিন্তু

দুশমন আইয়া পড়ছে…চলো পালাও।'

ভিড়ে মিশে গেল শিশুর মা এবং বাবা।

মহুয়া শিশুটিকে তুলে নিয়েছে কোলে। কিন্তু শিশুর দিকে মনোযোগ দেবার সময় তার কোথায়! বৃদ্ধা এক নারী অকস্মাৎ নিজের কপালে হস্তাঘাত করতে করতে লীনার সামনে এসে দাঁড়াল। বৃদ্ধা বলছে, 'মাগো, আমার মাইয়াডারে দেখছনি?'

লীনা বলল, 'কি নাম তোমার মেয়ের। কোথায় থাকো তোমরা?'

'নদীর কেনারায় থাহি! মাইয়াডা হারাইয়া গেছে। জোয়ান মাইয়া, হায় খোদা এ তুমি কি করলা! মাইয়ার ইজ্জত তুমি কাইড়া নিবার চাও…!'

বৃদ্ধা তার মেয়ের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ভিড়ে মিশে গেল।

এই করুণ দৃশ্য দেখতে দেখতে নিজেদের বিপদের কথা মনেই রইল না মহুয়ার। কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু হাজার হোক মেয়ে মানুষ তারা দু'জন, নিজেদেরই নিরাপত্তা নেই এতটুকু। এই হাজার হাজার নর-নারীর জন্যে কিই বা করার আছে তাদের।

নেই, আবার আছেও। এমন করে ছুটে কোথায় যাচ্ছে ওরা? ছুটলে কি পরিত্রাণ পাওয়া যাবে?

দল বেঁধে কোথায়, কোনদিকে ছুটছে তা কেউই জানে না।

পথের মাঝখানে দাঁড়াল মহুয়া। ছুটন্ত লোকজনদেরকে বাধা দিল দুই হাত মেলে। বলল, 'ছুটবেন না আপনারা। যে যার বাড়ির সামনে থাকুন। ফিরে যান আপনারা। পালাবেন কোথায়?'

কিন্তু কে কান দেয় অপরিচিত এক নারীর কথায়? ছুটতে পারলেই যেন সবাই বাঁচবে। তাই কোন কথাতেই তারা কান দিচ্ছে না।

অসহায়ভাবে এদিক ওদিক তাকাল মহুয়া। পরমুহূর্তে কি যেন দেখল ও। আতঙ্কে ভয়ে, বিস্ময়ে পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল মহুয়ার সর্বশরীর। লীনা ছুটে এসে শক্ত করে চেপে ধরল মহুয়ার একটা হাত। কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে সে শুধু উচ্চারণ করল, 'মহুয়াদি!'

চোদ্দ

গত প্রায় আধঘন্টা ধরে এক নাগারে মানুষ কেবল গেছে পুব দিকে।

অকস্মাৎ হাহাকার রবে মথিত হয়ে উঠল চারদিক। ফিরে আসছে মানুষ। দলে দলে সবাই পড়ি মরি করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ফিরে আসছে।

মানুষগুলো যেদিকে গিয়েছিল সেদিকে নিরাপত্তা নেই। সেদিক থেকে এগিয়ে আসছে পাঞ্জাবী সেনারা।

অদূরে দেখা যাচ্ছে আগুন।

'বাঁচাও!' বাঁচাও!'

চারদিকে সাহায্যের ডাক। কিন্তু কেউ ফিরে তাকাচ্ছে না।

আরও কয়েকটা মিনিট কেটে গেল। তারপর হঠাৎ শুরু হলো আবার এক বর্ণনাতীত বিশৃঙ্খলা।

পথের পর মাঠ, ধানখেত। তারপর আবার একটা গ্রাম। সে গ্রামের লোকেরা এতক্ষণ এদিকে আসার চেষ্টা করেনি। কিন্তু এ গ্রামের লোক মাঠ, ধান খেত পেরিয়ে ও গ্রামের দিকে রওনা হতেই দেখা গেল ও গ্রামের লোকেরা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে এ গ্রামেরই দিকে।

বাঁচার কোন উপায় নেই।

আগুন এগিয়ে আসছে। আধ মাইল দূরে এখনও আগুন। কিন্তু দূরত্ব ক্রমশই কমছে।

মানুষের ভীড়ে খরকুটোর মত ভেসে যেত মহুয়া এবং লীনা। কিন্তু পথ ছেড়ে ওরা দাঁড়িয়ে আছে মাঠে। মহুয়া দেখছিল আগুনের বিস্তৃতি। চারদিকে আগুন। পালাবার কোন পথ নেই। আধঘন্টা, বড় জোর এক ঘন্টার মধ্যে এদিকেও আগুন জ্বালানো হবে।

'মহুয়াদি!'

'ভয় কি, লীনা। যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ সাহস হারাব কেন ভাই? আয়, মনে মনে আমরা আল্লাকে ডাকি।'

লীনার কাঁধে হাত দিয়ে নিজের আরও কাছে টেনে আনল মহুয়া তাকে।

ক্রমশ দিনের আলো ফুটতে শুরু করল পুবদিক রাঙা হয়ে উঠার পর। আলোয় মানুষের মুখ দেখে শিউরে উঠতে হয়! মানুষগুলো যেন সামান্য একটি ঘন্টায় ভূতের মত হয়ে গেছে।

মাঠে বসে আছে কত লোক। কেউ ছুটোছুটি করে খুঁজছে তারা-ছেলে-মেয়ে স্ত্রীকে। কেউ কেউ পথের পাশে শুয়ে কাঁদছে চিৎকার করে। আবার অনেককে দেখা গেল স্রেফ পাথরের মত নির্বাক হয়ে গেছে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে তারা দূরবর্তী অগ্নিশিখার দিকে।

বেলা আটটার দিকে পাশের গ্রামে আগুন দিল পাঞ্জাবী-সেনারা।

পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল সব। গ্রামটাকে ঘিরে ফেলেছে শয়তানরা। চারপাশ থেকে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।

এ-গ্রামের লোকেরা ঠকঠক করে কাঁপছে। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দুরু দুরু বুকে বিস্ফারিত নেত্রে আধমাইল দূরবর্তী গ্রামের করুণ অবস্থা দেখছে সবাই।

গ্রামটা পুড়ছে। আগুনের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ছটফট করতে করতে দু'একজন করে বেরিয়ে আসছে ফাঁকা জায়গায়। অমনি গর্জে উঠছে রাইফেল।

মহুয়া এবং লীনা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখল অনেকক্ষণ ধরে নরপিশাচদের

কাণ্ডকারখানা। মহুয়া বিশেষ একটি ব্যাপার লক্ষ করছিল অনেকক্ষণ থেকেই। কিন্তু মুখফুটে লীনাকে সে কিছুই বলেনি।

কিন্তু লীনার চোখে ধরা পড়েছে ব্যাপারটা। হাজার হোক সে-ও তো যুবতী মেয়ে।

'মহুয়াদি।'

'কিছু বলবি রে?' জিজ্ঞেস করল মহুয়া।

'দেখতে পাচ্ছ, মহুয়াদি? ওরা সবাইকে গুলি করে মারছে, কিন্তু…।'

লীনা থেমে গেল। আতঙ্কে বুজে গেল ওর কণ্ঠ।

মহুয়া বলল, 'হ্যাঁ। তুই ঠিকই দেখেছিস। যুবতী মেয়েদেরকে ওরা গুলি করছে না। ধরে রাখছে। পাঁচ সাতজন একসাথে হলে হাত বেঁধে নিয়ে চলে যাচ্ছে কোথাও।'

'কিন্তু…।'

মহুয়া বলে উঠল, 'ওরা এদেশের মানুষকে গোলাম বানিয়ে রাখতে চায়, লীনা। ওদের দ্বারা যা সম্ভব ওরা তাই করবে। দেশের মেয়েদের কোন মূল্য নেই ওদের কাছে। ধরে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করবে। তারপর মেরে ফেলবে।'

'আমাদের কি হবে, মহুয়াদি!' লীনা কেঁদে ফেলল কথাটা বলেই।

গাল বেয়ে জল নেমে এল মহুয়ারও। লীনার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে ও বলল, 'মন খারাপ করিসনে, লীনা। খোদা নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করবেন।'

'মহুয়াদি, কুয়াশাদাদা এখন কোথায়?'

মহুয়ার ঠোঁটে একটু হাসি ফুটল। বলল, 'আমিও সে-কথা ভাবছি রে লীনা। আমরা বিপদে পড়ার আগে নিশ্চয়ই দাদা এসে পড়বেন।'

'কিন্তু যদি না আসেন। আর আসলেই তিনি কি…।'

মহুয়া লীনার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে উঠল, 'আশঙ্কার কথা বলিসনে, লীনা। না আসলে আমাদেরকে মরতে হবে। তোর দাদাও তো আসতে পারবে না, ওরা ঢাকায়।'

লীনা বলল, 'আমরা নিজেদের চেষ্টায় কি কিছুই করতে পারি না?'

তাই তো! লীনা তো ঠিকই বলেছে। এ মহা বিপদে কারও সাহায্যের আশা করা বোকামি। তারচেয়ে নিজেরা চেষ্টা করলে কি কোন উপায় হয় না?

মাটির দিকে তাকিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে শুরু করল মহুয়া। শহীদ হলে এরকম বিপদে কি করত সে প্রশ্নের উত্তর চায় সে।

ভেবে কোন কূলই খুঁজে পেলে না মহুয়া। লীনা হঠাৎ বলে উঠল, 'মহুয়াদি, ঘরে যাবে না?'

লজ্জায় যেন মরে গেল মহুয়া ঘরে যাবার কথা মনে পড়তে। শহীদের বন্ধুর স্ত্রী মিসেস বোরহান তার রুগ্ন শ্বশুরকে নিয়ে একা আছেন বাড়িতে। ভদ্রমহিলার খোঁজ

নেয়া উচিৎ ছিল আগেই।

শহীদের বন্ধু বোরহান আহমেদ ঢাকাতেই স্থায়ীভাবে বাস করতেন। কিন্তু বর্তমান বিপদের মাথায় স্ত্রী এবং রুগ্ন পিতাকে ঢাকা থেকে নিয়ে এসেছেন জিঞ্জিরার এই বাড়িতে।

বাড়িটা পাকা এবং দ্বিতল। এতদিন খালিই পড়েছিল। বর্তমানে নিচের তলাটা নিরাশ্রয় মানুষরা শহর ত্যাগ করে আশ্রয় নিয়েছে। কেউই তারা পরিচিত নন বোরহানের। বোরহান তাতে কোন আপত্তি করেনি। স্ত্রী এবং রুগ্ন পিতাকে রেখে গতকালই সে আবার শহরে গেছে। মহুয়া এবং লীনার জন্যে ব্যবস্থা করা হয়েছে উপরেরই একটি কামরা।

বাড়িতে ঢুকে হতবাক হয়ে গেল ওরা। নিচের তলার আশ্রয়প্রাপ্ত লোকেরা কেউ নেই। ঘর-দোর সব খাঁ খাঁ করছে।

সিঁড়ি বেয়ে উপর তলায় উঠে এল ওরা। মহুয়া শান্তস্বরে ডাকল, 'মিসেস বোরহান!'

মিসেস বোরহানের সাড়া পাওয়া গেল না। লীনা এগিয়ে গেল মহুয়াকে পাশ কাটিয়ে। মিসেস বোরহানের রুমের দরজা খোলা। ভিতরে কেউ নেই।

পাশের রুমটা মিসেস বোরহানের শ্বশুরের। মহুয়া দরজার সামনে গিয়ে ডাকল, 'মিসেস বোরহান।'

ভিতর থেকে কারও সাড়া পাওয়া গেল না।

দরজাটা ভেজানো। ধীরে ধীরে ঠেলা দিয়ে দরজা খুলল মহুয়া। পরমুহূর্তে ধ্বক করে কেঁপে উঠল তার বুক। রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখের চেহারা।

হাই ব্লাড প্রেশারের রোগী ছিলেন মিসে বোরহানের শ্বশুর।

মহুয়া দেখল বৃদ্ধের মাথা থেকে পা অবধি সাদা চাদরে ঢাকা। মিসেস বোরহান মৃতদেহের সামনে পাথরের মূর্তির মত বসে আছেন একা।

পনেরো

অসম্ভব শক্তিমতী নারী মিসেস বোরহান। ওদেরকে কামরায় ঢুকতে দেখে চমকে উঠে তাকালেন তিনি। কেউ কথা বলল না। কেটে গেল কয়েক মিনিট। তারপর একসময় মিসেস বোরহান উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'যিনি গেছেন তিনি গেছেন। আমাদের ওপর শুভ দৃষ্টি তিনি রাখবেন। আমরা এভাবে বসে না থেকে চলুন, আত্মরক্ষার চেষ্টা করি।'

মহুয়া কথা বলল না। লীনা সংক্ষেপে পাশের গ্রামের ঘটনাটা বলল। বিশেষ করে শয়তান পাঞ্জাবী সেনারা মেয়েদেরকে নিয়ে কি করছে সে ঘটনা খুলে বলল!

মিসেস বোরহান বললেন, 'ছাদে দাঁড়িয়ে সব আমি দেখেছি।'

মহুয়া বলল, 'বাঁচার উপায় কি, মিসেস আহমেদ?'

'প্রাণ যায় যাবে, মান-ইজ্জত হারাব না। আমাদের প্রতিজ্ঞা হবে কোন শয়তান যেন আমাদের গায়ে হাত ঠেকাতে না পারে।'

লীনা আবার কেঁদে ফেলল।

মহুয়া হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল। উপায় সে একটা পেয়ে গেছে! বলে উঠল সে, 'এক কাজ অনায়াসে করা যায়! হয়ত তাতে ফলও হবে!'

'কি কাজ!' মিসেস বোরহান জানতে চাইলেন।

মহুয়া বলল, 'লীনার দাদা ছদ্মবেশ নেবার সাজসরঞ্জাম সব রেখে গেছে। আমরা ছদ্মবেশ নিতে পারি।'

'কিসের ছদ্মবেশ? কিন্তু আমাদের চুল?'

লীনার কথার উত্তরে মিসেস বোরহান বললেন, 'চুল না হয় কেটে ফেলব।'

মহুয়া বলল, 'না, কেটে ফেলারও দরকার নেই। চুলে রঙ লাগাব। সব জিনিসই আছে মেক-আপ-বক্সে। আমরা ছদ্মবেশ নিয়ে সাজব বুড়ি। পাকা চুল। মুখে রেখা! হাত-পায়ের চামড়া শুকনো। চোখ গর্তে ঢুকে গেছে। কুঁজো হয়ে হাঁটব।'

'খুব কাজ হবে।' মিসেস বোরহানও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

লীনা বলল, 'হয়ত গুলি খেয়ে মরতেই হবে, কিন্তু তবু এটাই ভাল।'

'মরতে চাই না।'

বলল মহুয়া, 'কিন্তু ওরা ধরে নিয়ে গিয়ে যা করবে তার হাত থেকে বাঁচার জন্যে হাসতে হাসতে মরতে পারব আমরা।'

ক্রমশ বেলা চড়ছে। গ্রামবাসীদের অবস্থা অবর্ণনীয়।

বিকেল চারটের দিকে পুব এবং পশ্চিম দিক দিয়ে গ্রামে ঢুকতে শুরু করল পশু-সেনারা।

গ্রামের পুব এবং পশ্চিমে আগুন জ্বলে উঠল। দুই প্রান্তের অধিবাসীরা হাহাকার রব তুলে ছুটে পালিয়ে আসতে লাগল গ্রামের মাঝখানে। পশু-সেনারাও তাদের পিছু পিছু বেশ খানিকদূর এগিয়ে এল গুলি করতে করতে। এ যেন জঙ্গল ঘিরে ফেলে বাঘ শিকার।

প্রচণ্ড শোরগোল শুনে মহুয়া, লীনা এবং মিসেস বোরহান বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। তিন যুবতীকে এখন আর চেনবার উপায় নেই। ওরা তিনজনই পক্ককেশী বিগতযৌবনা অসহায় বৃদ্ধা মাত্র।

পথের উপর কাঁদছে মানুষ। কেউ ছুটছে, কেউ নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে।

মহুয়া ধান খেতের দিকে আঙুল বাড়িয়ে লীনার উদ্দেশে বলে উঠল, 'তুই যা দেখি লীনা, ওইখানে গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে মরার মত শুয়ে থাক। মরে গেছিস মনে করে...।'

গুলির শব্দ হলো। চমকে উঠে এদিক ওদিক তাকাল লীনা। ভয়ে রক্তশূন্য হয়ে গেছে মুখ। ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে পা বাড়াল সে।

মিসেস বোরহান অসহায় চোখে তাকাল, মহুয়ার দিকে।

অকস্মাৎ বাঁচার ইচ্ছায় উন্মাদ প্রায় কিছু লোক হুড়মুড় করে এসে পড়ল। ঝড়ের মত এল তারা। পঁচিশ তিরিশ গজ যাবার পরই কান-ফাটা শব্দ হলো স্টেনগানের। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল এক দল ছেলে-মেয়ে যুবক-যুবতী।

পড়ে গেলেন মিসেস বোরহানও পথের পাশে। গুলি তার গায়ে লাগেনি! ইচ্ছা করেই পড়ে গেছেন তিনি।

মহুয়া চোখের সামনে নারকীয় কাণ্ড দেখে পাথরের মত স্থির হয়ে গেছে। খুনীর দল এগিয়ে আসছে। মানুষ দৌড়াচ্ছে। তাদের পিছু পিছু দৌড়াচ্ছে খুনীর দল গুলি করতে করতে।

পথের পাশেই একটি একচালা। মহুয়া দেখল দু'জন বুড়ো লোক সেই একচালার বাইরের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে বসে কাঁদছে। মহুয়া পা বাড়াল।

বুড়োগুলোর পাশে গিয়ে বসল মহুয়া। পরস্পরের দিকে তারা কেউ তাকাচ্ছে না। বুটজুতোর শব্দ হচ্ছে। গুলির শব্দ হচ্ছে কানের পাশেই। আশপাশেই 'বাবারে' 'মারে' 'পানি দাও' ইত্যাদি কণ্ঠস্বর আহতদের।

'এই বুড্ডালোগ ইধার আও!'

চমকে উঠল মহুয়া। কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে সে তাকাল না। উঠে দাঁড়াল নিঃশব্দে।

'বোলো, জয় বাংলা বোলো!'

এবার তাকাল মহুয়া। তিনজন পশু-সেনা—দশ হাত দূরে। স্টেগান উঁচিয়ে রয়েছে। কথাগুলো বলছে তাদেরই একজন ওদের তিনজনকে উদ্দেশ্য করে।

ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে বুড়ো দু'জন পা বাড়িয়েছে। পশু-সেনারা দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল আবার, 'বোলো শালালোগ্, জয় বাংলা বোলো। শেখ মোজিবকো বুলাও, তোমহারা বাপকো বুলাও, দেখু উঁও গাদ্দার তুমলোগকো বাচা সাকতা ইয়া নেহি!'

বৃদ্ধদ্বয় এগিয়ে যাচ্ছে।

মহুয়া তাকিয়ে আছে পশু-সেনাদের হাতের স্টেনগানের দিকে।

এক পশু আর এক পশুকে বলল, 'ইয়ার, দের মার্ত করো। গোলি চালাও!'

গুলি চলল।

মহুয়া পড়ে গেল ধপ্ করে সেখানেই।

ষোলো

গুলি এবং আহতদের কাতর-ধ্বনি ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না অনেকক্ষণ। তারপর একসময় গুলির শব্দ মিলিয়ে যেতে লাগল ক্রমশ দূরে। তখন চোখ মেলল

মহুয়া। বাঁশ ফাটার বিকট আওয়াজ হচ্ছে চারপাশ থেকে।

আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে ঘর-বাড়িতে। বাঁশ গাছ পুড়ছে বাঁশ বাগানে। কাচা বাঁশ ফাটার শব্দে কান পাতা দায়। আহতদের যন্ত্রণাক্ত ধ্বনিও চাপা পড়ে যাচ্ছে। মহুয়ার সাদা শাড়ির আঁচল রক্তে ভিজে গেছে। তিন হাত সামনেই পড়ে রয়েছে দুই অশীতিপর বৃদ্ধের লাশ। লাশ দুটোর রক্ত গড়িয়ে এসে ভিজিয়ে দিয়েছে মহুয়ার একদিকের গাল।

এখনও মিসেস বোরহানকে দেখা যাচ্ছে পথের পাশে পড়ে থাকতে। মাথা তুলল মহুয়া। মহিলা বেঁচে আছেন কি না বোঝা যাচ্ছে না। মিসেস বোরহানের পাশে একটি যুবক। নড়ছে এখনও। আহত হয়েছে।

এদিক-ওদিক তাকাল মহুয়া। অনেক লাশ। কাঁদছে কে যেন আড়ালে। ছোট একটি কচি মেয়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল মহুয়া। এগিয়ে আসছে মেয়েটির কণ্ঠস্বর। বাবা বাবা বলে কাঁদতে কাঁদতে ডাকছে। মেয়েটিকে দেখতে না পেলেও মহুয়া মনোযোগ দিয়ে তার ডাক শুনছিল। হঠাৎ কাছেপিঠে কোথাও থেকে এক পুরুষের গলা শোনা গেলঃ আমি যাইতেছি চাঁন্দের মা— ।

তারপর সেই পুরুষ কণ্ঠ থেকেই অস্বাভাবিক জোরে বের হলো, 'খোদা…!'

তারপর সব চুপ।

মহুয়া শুনতে পেল আবার কচি মেয়েটির কণ্ঠস্বর। দূরে সরে যাচ্ছে কণ্ঠস্বরটি আবার।

উঠে বসল মহুয়া। পশুরা বোধহয় এ গ্রাম থেকে চলে গেছে।

উঠে দাঁড়াতেই আশ-পাশের অনেকদূর অবধি দেখতে পেল মহুয়া সবুজ রঙগুলো কালো হয়ে যাচ্ছে আগুনে পুড়ে এবং ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়। আর লাল রঙ দেখা যাচ্ছে যেখানে সেখানে।

আগুন আর রক্ত। যেদিকে চোখ পড়ছে সেদিকেই আগুন, সেদিকেই রক্ত।

মাথাটা বড় ঘুরছে। একপা দু'পা করে এগোল মহুয়া। টলছে পা দুটো। মিসেস বোরহানের দিকে চোখ পড়তেই দ্রুত হলো মহুয়ার চলার বেগ। মহিলা উঠে বসছেন।

মিসেস বোরহানের পাশে পড়ে রয়েছে আহত এক যুবক। মহুয়া হাঁটু মুড়ে বসল যুবকের পাশে। করুণ চোখে তাকিয়ে রয়েছে যুবকটি। মহুয়া হাত দিয়ে রক্তাক্ত লুঙ্গিটা ধরল। ঢেকে দিল যুবকের কোমরটুকু। মিসেস বোরহানের দিকে না তাকিয়েই মহুয়া দ্রুত বলল, 'বাড়িটায় কি আগুন দিয়েছে? ফার্স্ট-এইড বক্সটা যদি পাওয়া যায়। তবে আগে লীনার খবর নেয়া দরকার।'

মহুয়া পা ছড়িয়ে বসল পথের উপর। যুবকের রক্তাক্ত মাথাটা তুলে নিল দুই হাত দিয়ে নিজের কোলের উপর।

মিসেস বোরহান বিনাবাক্যব্যয়ে টলতে টলতে নেমে গেলেন নিচু ধানখেতের

দিকে।

চোয়ালে গুলি লেগেছে যুবকের। ক্ষতস্থান থেকে ঘাস, মাটি সরিয়ে দিল মহুয়া। বাঁচবে না ছেলেটা, ভাবল মহুয়া। প্রচুর রক্ত বেরিয়ে গেছে। চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা করার প্রশ্নই উঠে না। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। চোখ বুজে মরার মত পড়ে আছে যুবক। মরে গেছে নাকি?

পাল্‌স্‌ দেখল মহুয়া। মরেনি, তবে শেষ নিঃশ্বাস পড়তে খুব একটা দেরিও নেই।

পদশব্দে মুখ তুলে তাকাল মহুয়া। প্রৌঢ়া এক সাধারণ গ্রাম্য নারী কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তার কোলে একটি শিশু। রক্তে রাঙা হয়ে গেছে শিশুর সর্ব শরীর। মহুয়া ইঙ্গিতে বসতে বলল প্রৌঢ়াকে। প্রৌঢ়া বসল।

বলল, 'আমার নাতিটারে বাঁচামু কেমনে কও দেহি, মা।'

মহুয়া চমকে উঠল।

প্রৌঢ়ার কণ্ঠস্বর যেন কেমন। কথাগুলো আরও বিস্ময়কর। তার মৃত নাতিকে সে বাঁচাতে চাইছে।

শিশুর কপালে বড় দাগ। বেয়োনেট ঢুকিয়ে হত্যা করেছে পশুরা।

মিসেস বোরহান খানিকটা দূরে পথ অতিক্রম করছে আড়াআড়িভাবে। মহুয়া দেখতে পেয়ে হাত নেড়ে ডাকল।

মিসেস বোরহান দূর থেকেই বললেন, 'লীনা পানি আনতে গেছে। ভাল আছে সে। আমি বাক্সটা নিয়ে আসি বাড়ি থেকে।'

মাথার ওপর চিল আর শকুন ঘুরপাক খাচ্ছে। গা শিরশির করে উঠল মহুয়ার।

লীনা এক কলসী পানি নিয়ে এল। পানি দিল মহুয়া যুবকের ঠোঁট ফাঁক করে ধরে। পানি খাবার জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিল সে।

পানি খেয়েই চোখ মেলে চাইল। মহুয়ার দিকে চেয়ে থেকে কি যেন বলতে চাইল। কিন্তু পারল না। ঢলে পড়ল মাথাটা।

মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকাল লীনা।

ধীরে ধীরে মাথাটা নামিয়ে রাখল মহুয়া কোল থেকে।

মিসেস বোরহান ফার্স্ট—এডের বাক্স নিয়ে ফিরে আসছেন।

সেই প্রৌঢ়া এতক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল মহুয়ার দিকে। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল কোলে মৃত শিশুকে নিয়ে। মহুয়াও উঠে দাঁড়াল। দুই হাত প্রৌঢ়ার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে বলল, 'তোমার নাতিকে আমার কাছে দাও। আমি ওকে হাসপাতালে দিয়ে আসব।'

প্রৌঢ়া কি মনে করে মহুয়ার কোলে তুলে দিল মৃত শিশুকে। তারপর মহুয়াকে পাশ কাটিয়ে হাঁটতে লাগল যন্ত্রের মত।

তীরবেগে নেমে আসছে শকুনেরা।

মহুয়া আকাশের দিক থেকে চোখ নামিয়ে বলল, 'মিসেস বোরহান!'

'বলুন।'

সকলের গলার স্বরই কেমন যেন হয়ে গেছে। সকলের চোখেমুখেই কেমন যেন অস্বাভাবিক একটা পরিবর্তন এসেছে।

'মৃতদেহগুলোর কি হবে?'

কাঁদতে কাঁদতে আসছে একটি পরিবারের কয়েকজন। আধাবয়েসী এক পুরুষ, একটি কিশোর, দুটি ছয়-সাত বছরের ছেলেমেয়ে। পুরুষটির কোলে এক বৃদ্ধা সম্ভবত আহত হয়নি বুড়ি। হয়ত পঙ্গু চলৎশক্তিরহিত।

লীনাকে সামনে পেয়ে পুরুষটি কি যেন বলছে, চোখে পানি। খানিকপর লীনা ফিরে এসে মহুয়াকে বলল, 'ভাবী, ওদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। ওদের পরিবারের চারজন মারা গেছে।'

মহুয়া বলল, 'আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাও ওদেরকে। কিন্তু কিশোর ছেলেটি এবং লোকটিকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো। ওরা অনেক কাজ করতে পারবে।'

সন্ধ্যা হতে দেরি নেই। ঝোপ-ঝাড় থেকে, ধান খেত থেকে জীবিত মানুষরা একজন দু'জন করে বেরিয়ে আসছে। সবাই অপ্রকৃতিস্থের মত এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। কিন্তু কেউ কোন শব্দ করছে না। প্রতিটি লাশের সামনে ভিড়। প্রিয়জনকে খুঁজছে সবাই।

লীনা পুরুষ এবং কিশোরটিকে নিয়ে ফিরে এসে দেখল মহুয়া এবং মিসেস বোরহান ইতিমধ্যে বেশ কয়েক জন লোককে জড় করেছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে কোদাল।

নিচু জমিতে মাটি কাটা শুরু হলো। তারপাশেই একটি একটি করে নিয়ে এসে রাখা হলো লাশগুলো।

মহুয়া অপর একদলকে নিয়ে আহত মানুষদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। লীনা এবং মিসেস বোরহান ফিরে গেল বাড়িতে।

সন্ধ্যার পরপরই মিসেস বোরহানের বাড়িতে লোকেরা আহতদেরকে নিয়ে আসতে শুরু করল।

গ্রামের কয়েকজন বিধবা মেয়েকে মিসেস বোরহান পাঠিয়ে দিলেন রান্নাঘরে। তারা বিরাট এক ডেকচিতে চাল-ডাল ধুয়ে চড়িয়ে দিল চুলোয়।

আহতদের মধ্যে ভোর হবার আগেই মারা গেল পঁচিশ তিরিশজন।

পরদিন সকালে দুটি যুবক এল। মহুয়ার সাথে গোপনে কথা বলল তারা।

সারা দিন কাটল। সাতজনের মধ্যে মারা গেল আরও পাঁচজন।

সন্ধ্যার পর আবার এল সেই যুবকদ্বয়। আহত দু'জনকে নিয়ে মহুয়া, লীনা এবং মিসেস বোরহান তাদের সাথে বেরিয়ে পড়লেন।

নৌকোয় উঠে লীনা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা, ভাবী?'

মহুয়া কি যেন ভাবছিল মগ্ন হয়ে। লীনার প্রশ্নে চমকে ফিরে তাকাল। লীনা আবার প্রশ্নটা করল। মহুয়া বলল, 'বিক্রমপুরে আহতদের জন্যে মুক্তিবাহিনীরা হাসপাতাল করেছে। সেখানে যাচ্ছি আমরা কাজ করতে। পারবিনে, লীনা?'

'পারব না কেন! পারব বৈকি!'

অন্ধকার নদীতে এগিয়ে চলল নৌকা।

কত কথা মনে পড়ে মহুয়ার। কী সুন্দর সংসার তছনছ হয়ে গেল! পরিবারের কে কোথায় ভেসে গেল!

হঠাৎ দুই চোখ ভরে উঠল মহুয়ার লোনা পানিতে। গফুরের লাশটা ভেসে উঠল মানসপটে। বছরের পর বছর ধরে গফুর ছিল ওদের সাথে। গফুর বাড়িতে থাকলে কোনদিন কোন ব্যাপারে ভয় পেত না মহুয়া। গফুর একাই একশ ছিল। দিদিমনি বলতে অজ্ঞান ছিল।

সতেরো

দেশের শহরে-বন্দরে-গ্রামে, ঘাটে-মাঠে-বাটে নেমে এল অশুভ ছায়া। কিন্তু সময় বসে থাকল না। দিন গড়িয়ে রাত হলো। রাত ফুরিয়ে দিন হলো। কেটে গেল সুদীর্ঘ সাত সাতটি মাস।

এই সাতমাসে মহুয়া এবং লীনা অনেক বদলেছে কিন্তু ওদের নারী-ধর্ম ঠিকই আছে। সেবার মহৎ আদর্শে আজও ওরা অটল।

অনেক বিপদ থেকে অলৌকিক ভাবে বেঁচেছে ওরা। আবার অনেক সময় বুদ্ধি খাটিয়ে বেঁচেছে। কখনও কোথাও স্থিরভাবে আস্তানা গেড়ে কাজ করার সুযোগ পায়নি। আজ এখানে, কাল দশমাইল দূরের গ্রামে চলে যেতে হয়েছে।

পাঁচ মিনিটের নোটিসে হাসপাতালের রুগী, ওষুধ, যন্ত্রপাতি সব সাথে নিয়ে পালাতে হয়েছে বার কয়েক।

অনেক আপদে বিপদে পড়ে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে ওরা। উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, নৈরাশ্য, আতঙ্ক, এসবকে অনেকটা জয় করেছে ওরা। তাছাড়া আতঙ্কিত হবার দুশ্চিন্তা করার সময়ই বা কোথায়।

ন্যাটাডিঙির শেষ মাথায় হাসপাতালটা। আড়াই মাইল দক্ষিণে বেনাপোল কাস্টম চেক পোস্ট। ওখানে যুদ্ধ চলছে। রোজই আহত মুক্তিসেনারা আসছে হাসপাতালে। পশ্চিম দিকে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত। ওদিকে কোন হাঙ্গামা নেই। কিন্তু মাইল দশেক উত্তরে বেতনা নদীর ওপারে পাঞ্জাবী সেনাদের ঘাঁটি। নদীর এপারে শহীদ তার দলবল নিয়ে আছে। রোজই সংঘর্ষ হচ্ছে। আহত মুক্তিসেনারা ওখান থেকেও আসছে রোজ। আহতদেরকে বাঁচাবার জন্যে একজন মাত্র ডাক্তার। তিনজন মাত্র সেবিকা। মহুয়া, লীনা এবং মিসেস বোরহান। রাত দিন চোখে ঘুম নেই। মৃত্যু পথযাত্রী মুক্তিসেনাদের পাশ থেকে সরে যাবার উপায় নেই এক মিনিটের

জন্যেও।

যমে মানুষে লড়াই এখানে চব্বিশ ঘণ্টা। সময় বয়ে যাচ্ছে। টের পাওয়া যায় না। কাজ কাজ আর কাজ। অন্য কথা ভাববার সময় নেই।

ন্যাটাডিঙি ছোট্ট একটা গ্রাম। সীমান্ত থেকে মাত্র চার মাইল ভিতরে।

লাকসামপুরের হাটও ন্যাটাডিঙি থেকে মাত্র মাইল চারেক দূরে। শহীদরা ক্যাম্প করেছে ওখানেই। কুয়াশাও নাকি ওদিকে আছে। খবরাখবর দু'একদিন পরপরই পায় মহুয়া। কিন্তু দেখাসাক্ষাৎ নেই বহুদিন থেকে।

বেতনা নদীর ওপারে দখলদার বাহিনী। গত মাস দেড়েক ধরে প্রাণপণ চেষ্টা করছে তারা নদী পেরুতে। কিন্তু শহীদদের সাথে সুবিধে করতে পারছে না।

ইতিমধ্যে শহীদ কমিশনড র‍্যাঙ্কে উত্তীর্ণ হয়েছে। শহীদ এখন মেজর। রাসেল লেফটেন্যান্ট। কামাল ক্যাপ্টেন। কুয়াশা কোন ট্রেনিং নেয়নি।

ন্যাটাডিঙি গ্রামটা এলাকার শেষপ্রান্তে। উত্তরে আর কোন গ্রাম নেই বললেই চলে। রাহিলীপোতা অনেকটা দূরে পায়ে হাঁটা পথ। তারপরের গ্রাম মানমারি। মানমারির পর আন্দারপোতা পেরিয়ে লাকসামপুর।

লাকসামপুর বেশ বড় গ্রাম। পোস্ট অফিস আছে। রেলপথ থাকলেও এখন অচল। শহীদরা লাইন তুলে ফেলেছে অনেক আগেই।

ন্যাটাডিঙি থেকে যাতায়াতের অন্য কোন উপায় নেই, একমাত্র পায়ে হাঁটা পথ ছাড়া। গরুর গাড়ি অবশ্য যাওয়া আসা করে। বেনাপোল অবধি মেঠো পথ। নদী পথে যাওয়া যায়, কিন্তু ঘুরতে হয় অনেকটা।

ন্যাটাডিঙির পুকুরের পারেই দুইচালার একটি অস্থায়ী বাড়িতে হাসপাতাল।

সেদিন শনিবার। মহুয়া আহতদেরকে সন্ধ্যাকালীন খাবার খাইয়ে অফিসরুমে এসে মুখ হাত ধুচ্ছে। অফিসরুমেই যাবতীয় কাজ সারতে হয় ওদেরকে। এটাই খাবারঘর, শোবারঘর, বিশ্রামঘর। ওষুধপত্র এখানেই থাকে। মহুয়া, লীনা এবং মিসেস বোরহান এই রুমেই রাত কাটান। ডক্টর ইব্রাহিম রাত কাটান আহতদের সাথেই একটি চৌকিতে।

সন্ধ্যার পরপরই গোলাগুলির শব্দ শোনা যায়। গা সওয়া হয়ে গেছে।

আজ কিন্তু সকলেই একটু বেশি সচেতন। কারণ বিকেল তিনটে থেকে অবিরাম গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসছে।

এমন যে আগে কখনও হয়নি তা নয়।

আগেও হয়েছে। তবে আগে যে কোন একটা দিক থেকে গোলাগুলির অবিরাম শব্দ শোনা গেছে। আজ কিন্তু তার বিপরীত ব্যাপার। আজ বিকেল থেকে পূর্ব, উত্তর এবং দক্ষিণ দিক থেকে শব্দ আসছে।

দুশ্চিন্তার কারণ নেই আবার আছেও। মর্টারের শব্দ সবচেয়ে বেশি শোনা যাচ্ছে। ভারি কামানের গর্জনে কান পাতা দায়। সন্ধ্যার খানিক আগে মাদারতলা

থেকে চিনুর মা এসেছিল। সে একটা দুঃসংবাদ দিয়ে গেছে। কামানের একটা গোলা পড়েছে স্বরূপদেখায়।

ন্যাটাডিঙি থেকে মাত্র মাইল দেড়েক পুবে স্বরূপদেখা গ্রাম। ছোট গ্রাম। মসজিদের পাশের দুটো বাড়ির লোক জখম হয়েছিল। হাসপাতালে নিয়ে আসার পথে মারা গেছে।

চিনুর মা সাত গ্রাম ভিক্ষা করে বেড়ায়। লাকসামপুরেও যায় সে। কিন্তু আজ সে ওদিকে গেলেও লাকসামপুরে যেতে পারেনি। গিয়েছিল আন্দরপোতা অবধি। খাঁ খাঁ করছে গ্রামটা। লোকজন সব পালিয়েছে। ভয়ে পালিয়ে এসেছে চিনুর মা। ওদিকেও যুদ্ধ খুব জোরে সোরে বেধেছে। পাঞ্জাবী সৈন্যরা বেতনা নদী পেরিয়ে এপারে আসতে পেরেছে কিনা জানতে পারেনি সে। তবে নদী পেরোবার জন্যেই আদাজল খেয়ে নেমেছে নতুন করে খুনে সেনাগুলো তাতে কোন সন্দেহ নেই চিনুর মার।

সন্ধ্যা নামার আগেই ন্যাটাডিঙি এবং আশপাশের গ্রামগুলোয় নেমে এল উৎকণ্ঠার কালো ছায়া। রাত নামার সাথে সাথে আতঙ্কিত হয়ে উঠল মানুষ।

পায়ে আঘাত প্রাপ্ত দুইজন মুক্তিসেনা সমস্যার সৃষ্টি করল রাত আটটার দিকে।

বিকেল থেকেই আহত মুক্তি সেনারা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল গোলাগুলির শব্দ শুনে। মহুয়াদেরকে হাজারও প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে। সন্ধ্যার খাবার পরিবেশন করে মহুয়া নির্দেশ দিয়েছিল সবাইকে ঘুমুতে।

কিন্তু ঘুমোয়নি ওরা কেউই।

আটটার সময় খেতে এসেছিল লীনা এবং মিসেস বোরহান। ডক্টর ইব্রাহিম নামাজ পড়বার জন্যে অজু করতে গিয়েছিল পুকুরে। হঠাৎ আহত একজন মুক্তিসেনা কাতরে উঠল ব্যথায়।

আগে থেকেই ফিসফিস করে কথা বলছিল ওরা নিজেদের মধ্যে। ওদের কথার দিকে কান ছিল না মহুয়ার।

শহীদ কামাল এবং কুয়াশার কথা মনে মনে ভাবছিল মহুয়া। কেমন আছে ওরা কে জানে। এমন সময় বিকট স্বরে কাতরাতে শুরু করল একজন।

ছেলেটা বড় চঞ্চল। জাহেদ ওর নাম। পায়ে গুলি লেগেছে। এসেছে মাত্র গত পরশু। পা'টা হয়ত কেটে বাদই দিতে হবে। মহুয়া তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'মরে যাচ্ছি আপা।'

'কি হলো হঠাৎ?'

নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছে জাহেদ ব্যথা সইতে না পেরে! বলল, 'পা ভীষণ ব্যথা করছে। আমি বোধহয় বাঁচব না। ডাক্তার ভাইকে ডাকুন···আপা। আমার আম্মা আছেন কোলকাতায়, ঠিকানাটা···।'

সন্দেহ করার কথা মনেই হলো না মহুয়ার। সাথে সাথে মনে পড়ে গেল

ইব্রাহিম সাহেব অজু করে চলে যাবেন মসজিদে। মসজিদ আবার স্বরূপদেখাতে। ফিরতে দেরি হবে। দেরি না করে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পড়ল মহুয়া।

মিনিট দশেক পরই ফিরে এল মহুয়া ডা. ইব্রাহিমকে সাথে নিয়ে।

ফিরে এসে আশ্চর্য এক দৃশ্য দেখল ওরা।

তিনজন মুক্তিসেনা ধরা পড়ল হাসপাতালের বাইরের গেটের সামনে। তারাও হাঁটতে পারে না। মাটিতে বসে কোমর ঠেলে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে হাসপাতাল থেকে।

বুঝতে বাকি রইল না কিছু। অনেক বুঝিয়ে অনেক ধমকে ভিতরে আনা হলো তাদেরকে। কেঁদেই সারা সবাই।

সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। আহত প্রতিটি মুক্তিসেনা শব্দ করে কাঁদছে।

জাবেদ এবং নুরুল নামে দুটো ছেলেকে পাওয়া গেল না। দু'জনারই একটি করে পা খোঁড়া। ভাল এক পা সম্বল করেই তারা পালিয়েছে। যাবার সময় স্টেনগান নিয়ে যেতে ভোলেনি।

দেশ এমন এক আকর্ষণ। দেশকে মুক্ত করার যুদ্ধ যখন দোরগোড়ায়, তখন কে চায় ঘরে বসে থাকতে? হোক সে আহত।

জাবেদ এবং নুরুলকে খোঁজার জন্যে গ্রামের চারজন লোককে পাঠানো হলো দুই দিকে। ডা. ইব্রাহিম এবং মহুয়া গেল অন্য আর একদিকে।

জঙ্গল, জলা, ধানখেত ইত্যাদি পেরিয়ে রাহিলীপোতা অবধি গিয়েও ওদের খবর পাওয়া গেল না। কিন্তু রাহিলীপোতা গিয়ে ওরা যা দেখল তা অবর্ণনীয়। সারাটা গ্রাম তছনছ হয়ে গেছে কামানের গোলায়। বেশির ভাগ গ্রামবাসীই মারা গেছে।

পরবর্তী উত্তরের গ্রাম পায়রাখোপি। কে জানে সেখানের অবস্থা আরও কি ভয়ানক।

ডা. ইব্রাহিম নিবেদিত প্রাণ। মহুয়াও তাই। কিন্তু রাহিলীপোতার অবস্থা দেখে নিদারুণ মুষড়ে পড়ল। শহীদ আছে উত্তরে। না জানি তাদের কি অবস্থা।

ডা. ইব্রাহিম আহতদের চিকিৎসা করার কথা ভাবছিলেন। মহুয়াকে রেখে তিনি ফিরতে চান ন্যাটাডিঙিতে। ওষুধপত্র আনা দরকার।

মহুয়া ইতস্তত করছিল কি যেন ভেবে। এমন সময় আন্দরপোতা থেকে একদল লোক এল।

দুঃসংবাদের চরম। আন্দরপোতা নিশ্চিহ্ন প্রায়। মানমারির অবস্থাও তাই। মহুয়ার প্রশ্নের উত্তরে লাকসামপুরের অবস্থা কেউ জানাতে পারল না। অবস্থা নিশ্চয় সেখানের আরও খারাপ।

তবে কি পাঞ্জাবী সেনারা শিকারপুর বা সুরা গ্রামের নিকটবর্তী বেতনা নদী অতিক্রম করেছে? নাকি লাকসামপুরের কাছে নদী পেরিয়ে এপারে চলে এসেছে?

রাত দশটায় শিকারপুরের পলায়নরত দু'জন লোক এল।

যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল তাই। শিকারপুরের কাছেই নদী পেরিয়ে এপারে এসেছে দখলদার বাহিনী।

রাহিলীপোতায় থাকা নিরাপদ নয়। সক্ষম পুরুষদেরকে দিয়ে আহতদের নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হলো রাত এগারোটায়।

গরুর গাড়ি অবশ্য পাওয়া গেল খান চারেক। তাতেই ওঠানো হলো অবশেষে আহতদেরকে।

ভোর সাড়ে চারটের সময় ওরা পৌঁছুল ন্যাটাডিঙিতে। এত দেরি হবার কারণ ঘুরপথে এল ওরা। বান্দরপুর, রায়পুর, বাওয়ালিয়ামানকি—এই তিন গ্রাম থেকে আহতদেরকে উঠিয়ে নেয়া হলো গাড়িতে। প্রতিটি গ্রাম কামানের গোলায় ক্ষতবিক্ষত। আহতদেরকে ফেলে অসহায় গ্রামবাসীরা পালিয়েছে। গ্রামবাসী বলতে বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, শিশু এবং নারী। যুবকেরা কেউ বাড়িতে নেই। সবাই চলে গেছে দূর দূরাঞ্চলে যুদ্ধ করতে।

ন্যাটাডিঙিতে ফিরে এসে নতুন কোন দুঃসংবাদ ওরা পেল না।

দুঃসংবাদ ব্যাপকহারে আগামীকাল সকালে আসার জন্যে অপেক্ষা করছে। কিন্তু ওরা তা কেউ কল্পনা করার অবকাশও পেল না।

ভোর হয়ে গেল আহতদেরকে বাঁচাবার সংগ্রামে।

জাবেদ এবং নুরুলের কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। সকাল হবার পর মহুয়া আবিষ্কার করল যে চারজন লোক ওদের খুঁজতে গিয়েছিল তারাও ফিরে আসেনি।

আঠারো

ভোর হলেও বিপদের গুরুত্ব তেমন করে কেউ টের পায়নি। বেলা যত বাড়তে লাগল ততই পরিষ্কার হতে লাগল সব।

পূবে বাঁশবাড়ীয়ার কাছেও বেতনা নদী অতিক্রম করেছে খান-সেনারা। নিজামপুর মাদারতলা হয়ে রাহিলীপুরে পৌঁছেছে তারা—এখবর পেল ওরা বেলা এগারোটায়।

মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়ল মহুয়ার। লাকসামপুর এবং ন্যাটাডিঙির মাঝখানে রাহিলীপুর। তারমানে শহীদদের সাথে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

বেলা বারোটার সময় খবর এল আরও ভীতিকর।

শিকারপুরের কাছে নদী পেরিয়ে এপারে দখলদারবাহিনী পৌঁছলেও নীকমানপুর জয় করতে পারেনি। বরং সীমান্তের দিকে হটে যেতে হয়েছে তাদেরকে। মুক্তাদহ, দূর্গাপুর হয়ে বান্দরপুরের দিকে আসছে।

এরপর রইল দক্ষিণ দিক। পালাবার একমাত্র পথ। কিন্তু বেলা দুটোর দিকে অসহায় গ্রামবাসীরা মৃত্যুভয়ে দিশেহারা হয়ে ছুটে এসে পড়ল দলে দলে

ন্যাটাডিঙিতে।

বেলাবোলে এসে গেছে পশুরা। রেলপথ ওদের দখলে।

শত্রু ঘিরে ফেলেছে এলাকাটা। আহতদের সেবা কার্যের মাঝখানে অসংখ্য খবর কানে আসছে। মুক্তির কোন উপায় নেই একথা কারও জানতে বাকি নেই। তাই সকলের কাজেই ত্রুটি থাকছে।

প্রাণের ভয় বড় ভয়। লীনা বিকেলের দিকে কানে তুলো গুঁজল। গোলাগুলির শব্দ অসহ্য। মিসেস বোরহান মহুয়াকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন চারটের দিকে। লীনা অসুস্থ হয়ে পড়ল। ডা. ইব্রাহিম অনেকক্ষণ ধরে কি যেন বলি বলি করছিলেন। সাড়ে চারটেয় নিজেকে বাধা দিয়ে রাখতে পারলেন না তিনি। শেষ অবধি মহুয়াকে ডেকে কথাটা বলেই ফেললেন।

'মহুয়া আপা, কি করব?'

মহুয়া বুঝতে পারল প্রশ্নটা। কিন্তু উত্তর দিতে পারল না অনেকক্ষণ। ও জানে মুক্তির কোন পথ খোলা নেই। পশুরা সীমান্ত বরাবর তো আছেই। অন্যান্য তিন দিকেও আছে। সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে যাবার উপায় এখন আর নেই। সে সময় পেরিয়ে গেছে।

মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু তবু মহুয়া এতটুকু বিচলিত হয়নি।

শেষ ভরসা কুয়াশা।

মহুয়া উত্তরে বলল, 'আহতদেরকে ফেলে পালাব না আমরা। মরতে হয় ওদের সাথে মরব।'

কুয়াশার কথা মনে পড়ল। এই বিপদে কি সে সাহায্য করবে না?

আশায় দুলে উঠল মহুয়ার বুক।

কিন্তু কুয়াশা কি সাহায্য করতে পারবে এযাত্রা?

বেঁচে থাকার আশা কি সফল হবে মহুয়ার?

কুয়াশা ৩৬

প্রথম প্রকাশঃ মার্চ, ১৯৭৩

এক

ট্রেঞ্চের ভিতর গলা থেকে শরীরের নিচের অংশ। কেবল মাথাটা ট্রেঞ্চের বাইরে! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেটে গেল রাত।

রেডিয়াম লাগানো হাতঘড়িতে সাড়ে চারটে বাজে। হরিণদিয়ার মসজিদ থেকে আর খানিক পরই আজানের সুস্পষ্ট ধ্বনি ভেসে আসবে।

বেতনা নদীর ওপারে অন্ধকার। ট্রেঞ্চের বাইরে বেরিয়ে আসতে আসতে অন্ধকার নদীটা তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিল রাসেল। অন্ধকারে খালি চোখে দেখা যাচ্ছে না কিছু। কিন্তু কুকুরগুলো আছে ওপারে। ট্রেঞ্চের ভিতর দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

কিন্তু কেন এই অপেক্ষা? মনে মনে কারণ খুঁজতে থাকে রাসেল। দুশ্চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে ও। গত পাঁচদিন থেকে টুঁ-শব্দ নেই ওপার থেকে। অথচ গতকাল অবধি শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে ওদের।

আজ সোমবার। গত বুধবার থেকে দলে দলে এসেছে পাঞ্জাবী সেনারা! তাদের সাথে এসেছে মর্টার, রকেট, মেশিনগান। গতকাল অবধি শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে শত্রুদের। রাসেলের হিসাব যদি ভুল না হয় তাহলে খান-সেনাদের সংখ্যা এখন পাঁচশোর কম নয়।

অথচ নদীর এপারে মুক্তি সেনারা মাত্র ছয় জন। তবু কেন অপেক্ষা করছে ওরা? কেন আক্রমণ করছে না।

গত পরশু থেকেই এই প্রশ্ন ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে রাসেলকে। সঠিক উত্তর খুঁজে পায়নি ও।

শহীদ এদিকে নেই। উত্তরে গেছে সপ্তাহ খানেক আগে। কোন খবরও পাঠায়নি। অন্যান্য ফ্রন্ট থেকেও কোন খবরাখবর আসছে না। অথচ প্রতিদিন খবর আসার কথা। খবর আসে কুয়াশার ফ্রন্ট থেকেও। দারুণ যুদ্ধ করে যাচ্ছে কুয়াশা দলবল নিয়ে। তারও কোন খবর নেই।

আগস্ট মাসেও সীমান্ত থেকে বেতনা নদীর মধ্যবর্তী এলাকাটা দখলদার বাহিনীর অধিকারে ছিল। সেপ্টেম্বর মাসের পয়লা তারিখে শহীদ একদল নিয়ে সীমান্ত দিয়ে ঢুকে পড়ে বাংলাদেশে।

কমিশনে যোগ দিয়ে শহীদ মেজর হয়েছে। শহীদের অধীনেই কাজ করছে ওরা সবাই। শহীদ রাসেলকে কমান্ডারের দায়িত্ব দিয়ে উত্তরের মুকুন্দপুর সীমান্ত অতিক্রম

করার নির্দেশ দেয়।

শহীদ সীমান্ত পেরিয়ে বেনাপোলে এসে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। খান-সেনারা প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে পালিয়ে যায় রেলপথ ত্যাগ করে। রাসেল এবং তার অধীনস্থ মুক্তি সেনারা খান-সেনাদেরকে বিতাড়িত করে বেতনা নদীর অপর পারে পালাতে বাধ্য করে।

কমান্ডার শাজাহান শহীদের নির্দেশে সাতরাপাড়া দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে সোজা পুবদিকে এগিয়ে যায়। সাতরাপাড়া থেকে পুবদিকের বেতনা নদীর দূরত্ব বারো-তেরো মাইল। মাত্র বারো ঘণ্টায় দখলদার বাহিনী পরাজয় বরণ করে নদী অতিক্রম করে প্রাণ বাঁচায়।

ফলে গোটা এলাকাটা দশ-বারো মাইল মুক্ত হয় সেপ্টেম্বর মাসের দুই তিন তারিখের মধ্যেই।

এটা অক্টোবর। গোটা সেপ্টেম্বর মাস এবং অক্টোবরের কয়েক দিন ধরে নদী পেরিয়ে শত্রু সেনাদের ঘাঁটিতে আক্রমণ চালিয়েছে ওরা। কখনও রাতের অন্ধকারে নদী পেরিয়ে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা এপার থেকে মর্টারের গোলা বর্ষণ করে শত্রুদেরকে নাজেহাল করা হয়েছে। কিন্তু বড় ধরনের যুদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। কারণ সেপ্টেম্বর মাসের সাত তারিখ থেকে সব ক'টা ফ্রন্টে শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে শত্রুদের। এদিকে এতবড় মুক্তাঞ্চলে মুক্তি বাহিনীর সংখ্যা সর্বসাকুল্যে মাত্র চল্লিশ জন। শত্রুদের মোট সংখ্যা হাজার তিনেক। এখন আরও অনেক বেশি। অবশ্য কুয়াশার দলবলকে বাদ দিয়ে মুক্তি বাহিনীর সদস্য চল্লিশ।

কেমন যেন থমথমে ভাব একটা। শান্ত কিন্তু গম্ভীর। অন্যান্য ফ্রন্টের অবস্থা জানা না গেলেও রাসেল অনুমান করে যে সব ফ্রন্টেই অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটছে।

উত্তরে রাজনগর। শহীদ সেখানে গেছে সংঘর্ষের খবর পেয়ে। কমান্ডার তৈয়ব তার দলবল নিয়ে আছে ওখানে। সম্ভবত যুদ্ধ চলছে বলে শহীদের দেরি হচ্ছে ফিরতে। মাত্র ছয় মাইল দূরে রাজনগর।

কিন্তু যুক্তিটা অচল। বুঝতে পারে রাসেল। মাত্র ছয় মাইল দূরে যুদ্ধ চললে শব্দ পাওয়া যাবেই। না, যুদ্ধ কোথাও চলছে না। সবগুলো ফ্রন্টই নিস্তব্ধ। গত কয়েক দিন কোন গোলাগুলির শব্দই কানে আসেনি।

এটা হরিণদিয়া গ্রামের শেষ প্রান্ত।

হরিণদিয়া লোকশূন্য বললেই হয়। গোটা গ্রামটায় দুজন বুড়ো, পাঁচজন প্রৌঢ়া, তিনটে বাচ্চা ছেলে-মেয়ে এবং একজন রুগ্ন যুবক ছাড়া আর কেউ নেই। আশপাশের অন্যান্য গ্রামগুলোর অবস্থাও প্রায় তাই। খবর নিয়ে আসা যাওয়ার মত লোক মেলে না। সাথীদের কাউকে পাঠানোও অসম্ভব। কামাল যেতে চায়। কিন্তু রাসেল রাজি হয়নি।

নদীর ওপারে শত্রুদের ভিতর কেমন যেন একটা দৃঢ়তা লক্ষ্য করেছে রাসেল

ক'দিন থেকে। শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই। কিছু একটা করার কথা ভাবছে ওরা। মারাত্মক কিছুই হবে। পরিকল্পনাটা জানা সহজ নয়। কিন্তু অনুমান করা কঠিনও নয়।

সম্ভবত গোটা মুক্তাঞ্চলের উপর চারিদিক থেকে একই সময়ে আক্রমণ চালাবে ওরা। জিরো আওয়ারের জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা। তার আগে অবধি চুপচাপ আছে, থাকবে।

কান খাড়া হয়ে উঠল রাসেলের। অভ্যাসবশত ট্রিগারে চেপে বসল আঙ্গুল। একটু নড়ল স্টেনগানটা তারপর স্থির হলো। তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে নদীটা রাসেল।

নদীর পানিতে শব্দ হয়েছে। হয়ত বড় মাছ মাথা তুলেছিল।

'কামাল ভাই, সাবধান!'

ফিসফিস করে বলল রাসেল।

অন্ধকারে নদীর পানি দেখা যাচ্ছে না ভাল। কিন্তু অন্ধকারও অনেক রকম। কোথাও গাঢ়, কোথাও একটু হালকা।

নদীর ওপর ভাসমান অবস্থায় গাঢ় একটুকরো অন্ধকার। এগিয়ে আসছে দ্রুত।

সরু বেতনা নদী। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি হলেও এখনও শুকিয়ে যায়নি।

বিস্ময় বাধ মানছে না রাসেলের। গোলমাল হয়ে যাচ্ছে হিসেব। শত্রু বাহিনীর সংখ্যা এবং অস্ত্রবল কয়েকশো গুণ মুক্তি সেনাদের তুলনায়। অথচ চুপিসারে এপারে আসতে চাইছে কেন ওরা?

আবছা এবং অস্পষ্ট হলেও নদীর মাঝখানে গাঢ় কালো রঙের দ্রুত অগ্রসরমান বস্তুটি যে একজন মানুষ তাতে কোন সন্দেহ রইল না রাসেলের।

শত্রু আসছে।

কিন্তু শত্রু মাত্র একজন। এ আর এক বিস্ময়।

তবে কি তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্য নিয়ে আসছে শত্রু?

নদীর পাড় বলে কিছু নেই এপারে। নদীর যেখানে শেষ; ধান খেতের, পাট খেতের সেখানেই শুরু।

পাট খেতের ভিতর ট্রেঞ্চ। সামনের ট্রেঞ্চে রাসেল। ডানে, পনেরো বিশ হাত দূরে সামাদ, তৈয়ব। পাঁচ হাত পিছনে কামাল একা। বাঁয়ে ওদুদ। সামাদ এবং তৈয়বের কাছে মর্টার।

মালেক আছে গোলাবারুদ নিয়ে হরিণদিয়ায়।

নদী পেরিয়ে ডাঙায় উঠেছে শত্রু। লম্বা চওড়া প্রকাণ্ড দেহ। হাতে একটি এল. এম. জি.। কোন ভয় নেই লোকটার। লম্বা লম্বা পা ফেলে ফাঁকা জায়গাটার উপর দিয়ে সোজা পাট খেতের দিকে এগিয়ে আসছে।

ব্যাপার কি! পলে পলে বিস্ময় বাড়ে রাসেলের। পাঞ্জাবীরা পৃথিবীর সেরা গর্দভ তা দুনিয়ার মানুষ জানে। কিন্তু এতই গর্দভ। শত্রু এলাকায় কেউ অমন বুক ফুলিয়ে

লম্বা লম্বা পা ফেলে যুদ্ধজয়ী বীরের মত হাঁটে?

হাসি পেল রাসেলের। কিন্তু হাসতে পারল না। কেমন যেন খটকা লাগছে। রহস্য একটা আছে এর ভিতর। কিন্তু কি রহস্য?

সোজা রাসেলের ট্রেঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে লোকটা। ট্রেঞ্চের পাশেই মাথা উঁচু করে শুয়ে রয়েছে রাসেল। ওর সামনে লম্বা সরু সরু পাট গাছ কয়েকটা। কিন্তু অস্পষ্ট হলেও দেখা যাচ্ছে অন্ধকারে ডোবা জায়গাটা।

এগিয়ে আসছে ছায়ামূর্তি।

চমকে উঠল একটু রাসেল।

কুয়াশা!

ছায়ামূর্তির হাঁটার ভঙ্গি দেখেই চিনে ফেলল রাসেল। কিন্তু কুয়াশা এল কিভাবে?

নদীর ওপারে শত্রু। শত্রু এলাকা প্রায় পাঁচ মাইল অবধি বিস্তৃত। তারপর নৌঘাটা। কুয়াশার এলাকা। নৌঘাটায় কুয়াশা রাজা। শত্রু আছে বটে নৌঘাটার চারিদিকে। কিন্তু কুয়াশা এবং কুয়াশার দলবল শত্রুশক্তিকে প্রতিদিনই ধ্বংস করে দিচ্ছে বিপুলভাবে। প্রতিদিন কোন না কোন ফ্রন্টে শত্রুদল সম্পূর্ণ পরাজিত হচ্ছে। আবার রিইনফোর্সমেন্ট হচ্ছে অবশ্যি। কিন্তু কুয়াশাকে দমন করতে তারা আজ অবধি সফল হয়নি। প্রায় আট হাজার খান-সেনার কবর রচনা করেছে কুয়াশা এবং তার অনুগত অনুচরেরা। শত্রুপক্ষ কুয়াশার সাথে পেরে না ওঠার কারণ আছে।

যুদ্ধের অনেক আগে থাকতেই অদ্ভুত সব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছিল কুয়াশা। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে তার গবেষণাগার ধ্বংস করে দেয়ায় অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্র নষ্ট হয়ে যায় কুয়াশার। গত সাত মাস যুদ্ধ চলছে। এই সাত মাস দম ফেলবার মত সময়ও কুয়াশা পায়নি। তবু, এত কিছুর মধ্যেও দু'একটা অস্ত্র সে তৈরি করেছে। সে সব অস্ত্র দেখতে সামান্য হলেও কাজে এক কথায় অসামান্য। খান-সেনারা কুয়াশার সেই সব অস্ত্রের সামনে কোন মতেই পানি পাচ্ছে না হালে।

স্টেনগান হাতে ঝুলিয়ে ট্রেঞ্চ থেকে উপরে উঠল রাসেল।

'কে, শহীদ?'

কুয়াশা হন হন করে এগিয়ে আসতে আসতে পাট খেতের নড়াচড়া দেখে বলে উঠল।

'আমি রাসেল।'

পাটখেত থেকে বেরিয়ে এল রাসেল। বলল, 'আপনি? হঠাৎ শত্রু এলাকা থেকে?'

বিস্ময় বাধ মানছে না রাসেলের।

'শহীদ কোথায়?'

কুয়াশা রাসেলের সামনে এসে দাঁড়াল। রাসেলের একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিল

না সে।

'শহীদ ভাই উত্তরে গেছেন। কেন?'

কুয়াশার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল রাসেল। বড় রহস্যময় মানুষ! মনে মনে কুয়াশা সম্পর্কে ভাবল ও।

'ওকে একটা খবর জানাতে এলাম।'

বলল কুয়াশা। একটু যেন চিন্তিত মনে হলো তাকে। বলল, 'খবর পাঠিয়ে আনানো যায়?'

'না। খবর থাকলে আমাকে দিয়ে যেতে পারেন।' রাসেল একটু দৃঢ় করল কণ্ঠ।

'মহুয়ারা বিপদে পড়বে দু'এক দিনের মধ্যেই। তাই খবরটা দিতে এলাম। আর কাউকে পাঠাতে পারতাম। কিন্তু বিপদটা এমনই ভয়ঙ্কররূপ নিয়ে আসছে যে নিজেকেই আসতে হলো দায়িত্ব ছেড়ে।'

রাসেলের ঠিক বিশ্বাস হলো না কথাটা।

'মহুয়াভাবীরা তো ন্যাটাভিঙিতে। ওখানে আবার বিপদ কিসের?'

কুয়াশা বলল, 'বিপদ শুধু ওদের একার নয়। বিপদ তোমাদেরও। শত্রুরা গোটা মুক্তাঞ্চলের ওপর চারিদিক থেকে আক্রমণ চালাবে। মহুয়াদের এবং তোমাদের মাঝখানের পথ দখল করবে ওরা—মানে রাহিলীপোতায় ঘাঁটি করবে। শক্তিশালী ট্রান্সমিটার আছে আমার। ওদের কথাবার্তা ধরেছি। আগামীকাল কিংবা পরশু শুরু করবে ওরা জোড়েশোরে। ছয় হাজার শত্রু এক সাথে অ্যাডভান্স করবে।'

কি যেন ভাবল কুয়াশা।

তারপর বলল, 'মহুয়াদেরকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে ফেলা দরকার। আমিই যেতাম। কিন্তু আজকেই ফিরে যেতে হবে আমাকে। আমার অনুচররা আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না। শহীদকে খবরটা আজকেই পৌঁছে দিতে হবে। পারবে?'

'চেষ্টা করব। শহীদ ভাইও নিশ্চয় শত্রুদের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানেন। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবেন তিনি। কিন্তু শত্রু এলাকার ভিতর দিয়ে এলেন কিভাবে আপনি, মি. কুয়াশা?'

রহস্যময় এক টুকরো হাসি ফুটল কুয়াশার ঠোঁটে। বলল, 'ইচ্ছা থাকলে সব হয়। ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে চলে এলাম।'

পকেট থেকে টেনিস বলের চেয়ে কিছু ছোট দুটো গোল কালো জিনিস বের করল কুয়াশা। রাসেলের দিকে বাড়িয়ে দিল জিনিস দুটো সে।

বলল, 'রাখো এ দুটো। যেখানে ছুঁড়ে মারবে সেখানে পঞ্চাশ গজ জুড়ে আগুন জ্বলে উঠবে। রেখে দাও। কাজে লাগবে।'

হাত বাড়িয়ে জিনিস দুটো নিল রাসেল। লোহার মত ভারি জিনিস দুটো।

রাসেল হঠাৎ বলল, 'শহীদ ভাইকে সাবধান করে দেবার জন্যে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে দলবল ছেড়ে চলে এসেছেন। কারণ কি? আত্মীয়তা, তাই না? তা আত্মীয়তার

জন্যেই আপনারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেননি। শহীদ ভাই এতবড় বুদ্ধিমান এবং কৌশলী হওয়া সত্ত্বেও আপনাকে গ্রেফতার করে পুলিসের হাতে তুলে দিতে পারেননি। অথচ পারা উচিত ছিল। শহীদ ভাই তো পারেনই, এমন কি আমিও পারতাম। কিন্তু আপনাদের মধ্যে আত্মীয়তাই বাদ সেধেছে।'

চুপ করে রইল কুয়াশা।

তারপর কথা বলল সে। একটু যেন গম্ভীর শোনাল কুয়াশার কণ্ঠস্বর, 'শহীদ আমার আত্মীয়ই শুধু নয়, রাসেল। সে আমার বন্ধুও।'

রাসেল আবার কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু কুয়াশা বাধা দিয়ে বলল, 'ওসব কথা থাক রাসেল। আমার কথাগুলো ভাল করে শোনো। বিপদের খবরটা বাস্তব। শহীদ যেন খবরটা আজকের মধ্যেই পায়। তুমি যদি খবরটা পৌছে দিতে না পার তাহলে সে দায়িত্বও নেব আমি।'

রাসেল বলল, 'খবর আমি পৌছে দেব। কিন্তু যুদ্ধে তিনি এতই মগ্ন যে মহুয়া ভাবীদের কথা ভাববার সময় পাবেন কিনা বলা মুশকিল।'

'আমার কথা বলো। তাহলেই কাজ হবে।'

চলে গেল কুয়াশা নদী পেরিয়ে।

নদীর ওপারে গাঢ় অন্ধকার। অদৃশ্য হয়ে গেল কুয়াশা। অবাক বিস্ময়ে নদীর অপর পাড়ের দিকে তাকিয়ে রইল রাসেল। মানুষটা কি দুঃসাহসী। বিরাট এক শত্রু এলাকার ভিতর দিয়ে একাই চলে এসেছে সে। আবার একাই ফিরে যাচ্ছে।

শহীদের জন্যে কুয়াশার বুকে মায়া, স্নেহ, ভালবাসা যে প্রচুর তাতে কোন সন্দেহ রইল না রাসেলের।

দুই

পরদিনই রাসেলের খবর পেয়ে ফিরে এল শহীদ। শহীদের মুখে খবর শুনে গম্ভীর হয়ে উঠল রাসেল। কুয়াশা যেমন বলে গেছে তেমন ঘটনা ঘটার লক্ষণই দেখা যাচ্ছে সবগুলো ফ্রন্টে।

গোলাগুলি গত কয়েকদিন ধরে একেবারে করেনি বললেই চলে শত্রু! অথচ সবগুলো ফ্রন্টেই শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে ওদের।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা সবচেয়ে আগে করল রাসেল, 'আমরা অতিরিক্ত সাহায্যের আশা করতে পারি, শহীদ ভাই?'

শহীদ বলল, 'না। কারণ আমাদের এলাকাটা মুক্ত হয়েছে বেশ অনেকদিন হলো। শত্রুকে হটিয়ে দিয়েছি আমরা নদীর ওপারে। হাইকমান্ড জানে যে আমাদের শক্তি যথেষ্ট। তাছাড়া এখন আমাদেরকে সাহায্য করা সম্ভবও নয়। রীতিমত বড় একটা সংঘর্ষে জিতে এই এলাকায় ঢুকতে হবে মুক্তিবাহিনীকে। সাহায্যের আশা ছেড়ে দাও।'

রাসেল বলল, 'সেক্ষেত্রে অপেক্ষা করার কোন মানে হয় না। ওদের উদ্দেশ্য এখন পরিষ্কার। সব ক'টা ফ্রন্টে একযোগে আক্রমণ করবে ওরা। দেরি না করে আমাদের উচিত প্রথমে আক্রমণ করা। ওদের কয়েকটা ঘাঁটিতে একই দিনে গেরিলা আক্রমণ চালাতে হবে।'

শহীদ একমত হলো। বলল, 'তা ঠিক। তবে লোক সংখ্যা আমাদের বড় কম। রাজনগরের কাছে বেতনা নদী পেরিয়ে কমান্ডার শাজাহান এবং জহির দীপাদিহিতে আক্রমণ চালাতে গিয়ে শহীদ হয়েছে।'

রাসেল দাঁতে দাঁত চাপল, বলল, 'শাজাহানকে কেড়ে নিয়েছে ওরা! বেশ, শহীদ ভাই, আমি যাব দীপাদিহিতে। সঙ্গে অদুদ থাকবে।'

শহীদ রাসেলের দুই চোখের দিকে তাকিয়ে দেখল। লাল হয়ে রয়েছে চোখ দুটো। আপত্তি করতে পারল না শহীদ। বলল, 'তাই যাও।'

'আজ রাতেই যেতে চাই আমি! আপনি কি করবেন? মহুয়াভাবী…।'

শহীদ বলল, 'বেশ। আমি আরও একটি দিন দেখব।'

রাজনগর এবং দীপাদিহি।

বেতনা নদীর এপারে রাজনগর ওপারে দীপাদিহি। দুটোই ছোট গ্রাম।

গত পরশু গেরিলা আক্রমণ পরিচালনা করার সময় শাজাহান এবং জহির ওপারে নিহত হয়েছে। খান-সেনারা দীপাদিহি থেকে সরে গিয়ে ঘাঁটি করেছে তেবারিয়ায়।

সন্ধ্যার অনেক আগে রাসেল কামালকে সঙ্গে নিয়ে রাজনগরে পৌঁছুল। অদুদের বদলে কামালকে পাঠিয়েছে শহীদ। বলেছিল, 'আমি পারলে নিজেই যেতাম। কিন্তু আমাকে থাকতে হবে গোরপাড়া অপারেশনে। হরিণদিয়ার ওপারেই গোরপাড়া।'

রাজনগরে ছিল আসলাম, সাদেক আর জব্বার। ওদের কাছ থেকে রিপোর্ট নিয়ে রাসেল সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল।

সন্ধ্যার পর ক্রল করে নদীর প্রায় কিনারায় গিয়ে পৌঁছুল ওরা। পঁচিশ গজ পর পর ট্রেঞ্চ।

রাসেল এবং কামাল রইল একই ট্রেঞ্চে।

দীপাদিহি অন্ধকারে ডুবে আছে। শহীদের দেয়া বায়নোকুলার দিয়ে প্রায় আধঘণ্টা পর্যবেক্ষণ করার পরও কোন নড়াচড়া লক্ষ্য করা গেল না শত্রুদের।

সাদেকদের দেয়া রিপোর্টই ঠিক। দীপাদিহি ত্যাগ করে পিছিয়ে গেছে শত্রু। তেবারিয়ায় ঘাঁটি করেছে ওরা। দীপাদিহিতে হয় দু'একজন অবজারভার আছে ট্রেঞ্চে।

রাসেল সিদ্ধান্ত নিল রাত দুটোর দিকে নদী পেরিয়ে ওপারে যাবে ওরা। সঙ্গে যাবে কামাল। সাদেক এবং আসলাম শত্রুদেরকে ভুল বোঝাবার জন্যে মর্টার ছুঁড়বে

অবিরাম।

কিন্তু সব পরিকল্পনা তছনছ হয়ে গেল। রাত সাতটার পরই ঘটে গেল এক অপ্রত্যাশিত কাণ্ড।

প্রায় কাঁধ অবধি লম্বা চুল নেড়ে রাসেল বলল, 'প্রেম? ভালবাসা? তা ভালবেসেছি বৈকি। প্রেমেও পড়েছি। স্বাধীনতাকে ভালবাসি আমি। দেশের প্রেমে পড়েছি।'

হেসে ফেলল কামাল। বলল, 'সে তো খাঁটি কথা। দেশপ্রেম তো প্রায় সকলেরই আছে। কিন্তু আমি বলছিলাম...।'

রাসেল বাধা দিয়ে বলল, 'লীনার মত আমার কেউ আছে কিনা? নেই, কামাল ভাই, অভাগার তেমন কেউ নেই। ভালবাসা আমি পাইনি, প্রেয়সীরও নয়, বন্ধু-বান্ধবেরও নয়। বাবার স্নেহ ভালবাসা...তাও আমি পাইনি। আমি যখন ছোট্টটি তখন বাবা মারা যান। আম্মা ছিলেন অন্ধ। তাঁরই দরকার ছিল ভালবাসার। দিয়েছি। আম্মাকে আমি আমার চেয়েও বেশি ভালবাসতাম। আর বোনটি ছিল ছোট। বড় ভাইয়ের কাছ থেকেই চাইত সে ভালবাসা। তাকেও দিয়েছি। বন্ধু-বান্ধবদের সংখ্যা আমার নিতান্ত কম। কারণ কি জানেন, কামাল ভাই? সমবয়েসী ছেলেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, উদ্যম, সাহস এবং ন্যায়পরায়ণতা বড় কম। আমার মত কেউ নয়। জীবন সম্পর্কে আমার ধারণার সাথে আর কারও ধারণা মেলে না। মি. কুয়াশার সাথে আমার মনোগত বিরোধ লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়? কারণ কি জানেন? মি. কুয়াশা আমার বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বিরাট এক হিরো। তারা ওঁর সব কাজকেই অনুমোদন করে। আমি পারি না বলে তর্ক বাধে। এবং তর্কে তারা না পেরে আমার সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যায়। মি. কুয়াশা শ্রদ্ধার পাত্র। হাজার হোক প্রতিভাবান পুরুষ তিনি। কিন্তু বিপথগামী প্রতিভার যে-কোন অন্যায় কাজকে সমর্থন করাটা হীনমন্যতার পরিচয়। অন্তত আমি তাই মনে করি। বিজ্ঞানের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছেন তিনি। খুব ভাল কথা শ্রদ্ধা করতে হয় তাঁকে। কিন্তু তাঁর সাধনার প্রয়োজনে টাকা সংগ্রহের পদ্ধতি ন্যায়সঙ্গত নয় কেন? কেন তিনি মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন?'

এপারে অন্ধকার। ওপারে অন্ধকার। আকাশে মিটিমিটি জ্বলছে তারা। শিয়াল ডাকছে দূরে কোথাও। বহুদূর থেকে ভেসে আসছে গুলির শব্দ থেকে থেকে। নাইট বায়নোকুলার চোখে লাগিয়ে নদীর ওপারটা দেখছে রাসেল।

এক ব্যান্ডের পকেট রেডিও অন করে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ধরার চেষ্টা করছে আসলাম ডানদিকের ট্রেঞ্চে বসে।

অকস্মাৎ পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল রাসেলের সর্বশরীর। ফিসফিস করে বলল, 'কামাল ভাই, নড়বেন না, খবরদার!'

কি যেন অনুভব করছে রাসেল। এতটুকু নড়ছে না ও। কি যেন উঠে আসছে পা

থেকে উপর দিকে।

বিদ্যুতবেগে নুয়ে পড়ল রাসেল। অন্ধকারেই খপ্ করে ধরল কি যেন।

'কি হলো!' কামালের কণ্ঠে আশঙ্কা।

সিধে হয়ে দাঁড়াল রাসেল। ডান হাতে মোটা দড়ির মত কি যেন ধরা। মোচড় খাচ্ছে সেটা।

'সাপ!'

বলল রাসেল, 'গর্ত থেকে বেরিয়ে আমার প্যান্টের ওপর দিয়ে উঠছিল।'

'কি সাপ! কামড়াবে যে, ছেড়ে দিন!'

'কি সাপ জানি না।'

কথাটা বলে হেসে উঠল রাসেল। তারপর বলল, 'কামড়াবে কিভাবে! মেরে ফেলেছি!'

ট্রেঞ্চের ভিতর বসল দুজনা। দেশলাই জ্বালল কামাল। আঁতকে উঠল ও, 'এ যে জাত সাপ, রাসেল! কেউটে!'

রাসেল উঠে দাঁড়িয়ে নদীর দিকে মরা সাপটাকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'আর একটু হলেই দিয়েছিল ঠুকরে! মরে যেতাম, এত সাধের প্রতিশোধ নেয়া হত না।'

কামাল হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'স্বাধীন হতে আর কতদিন লাগবে বলো তো রাসেল?'

'পাঞ্জাবীগুলোকে এ বছরেই হয়ত ভাগিয়ে দেয়া যাবে বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্য পেলে। তা না হলে আরও ছয় মাস সময় লাগবে। কিন্তু মানুষের মুক্তি হয়ত এত তাড়াতাড়ি হবে না। শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আমাদের। একদল শোষককে তাড়াব, কে বলতে পারে আর এক দল শোষক আমাদের ঘাড়ে চেপে বসবে না। এ দেশের মানুষের মুক্তি আরও অনেক দেরিতে আসবে কামাল ভাই।'

কামাল বলল, 'তার মানে তুমি বলতে চাও…!'

'শ্ শ্ শ্…!'

ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ করতে বলল রাসেল।

দেখাদেখি কামালও কান পাতল রাসেলের মত। বাতাস বইছে। ঠাণ্ডা। স্টেনগানটা ট্রেঞ্চের উপরকার মাটিতে রেখে কি যেন শোনার চেষ্টা করছে রাসেল।

ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে চিৎকারটা।

'একটি মেয়ে!'

কামাল ফিসফিস করে বলল, 'পশুগুলো কোন গ্রাম থেকে ধরে এনেছে নিশ্চয়।'

রাসেলও শুনেছে। কথা বলল না ও। অন্ধকারে চোখ দুটো প্রতিহিংসায় জ্বলছে রাসেলের। হঠাৎ দাঁতে দাঁত চেপে রাসেল বলল, 'আমি যাব।'

কপাল থেকে চুল সরিয়ে বায়নোকুলারটা চোখে লাগাল রাসেল।

মিনিট খানেক পর প্রায় এক মানুষ সমান উঁচু ট্রেঞ্চ থেকে এক লাফে উপরে উঠে

গেল রাসেল।

কামাল বলে উঠল, 'যাওয়াটা উচিত হবে না রাসেল। বরং ক্ষতি হবে। রাত দুটোর সময় আমাদের প্রোগ্রাম···।'

রাসেল ট্রেঞ্চের উপর থেকে বলল, 'মেয়েটিকে বাঁচিয়ে আনা হয়ত সত্যি অসম্ভব। কিন্তু বোনের সম্মান এবং প্রাণ বাঁচাতে হলে অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা তো একমাত্র ভাইয়েরাই করতে পারে। আমি চললাম।'

ক্রল করে নদীর দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করে রাসেল।

কামাল পিছন থেকে বলে, 'আমিও আসছি।'

'না। আমি একা যাব। আমি যদি ফিরে না আসি তাহলে আপনি রাত দুটোর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করবেন।'

দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে রাসেল। অন্ধকারে খুব বেশি দূর দেখা যায় না। খানিক পরই হারিয়ে ফেলল কামাল রাসেলকে।

নদীতে মৃদু শব্দ হলো। শব্দ শুনে কামাল বুঝল রাসেল নদীতে নেমেছে।

নদীতে স্রোত। কলকল শব্দ হচ্ছে। কামাল একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে অনুমান করে নদীর দিকে। পাশের ট্রেঞ্চে আসলাম অফ করে দিয়েছে রেডিও। সেও উৎকণ্ঠিত হয়ে তাকিয়ে আছে নদীর দিকে।

সময় বয়ে চলে।

এতক্ষণে হয়ত রাসেল দীপাদিহির মাঝখানে চলে গেছে। অসহায় মেয়েটির চিৎকার ঠিক কতদূর থেকে এসেছিল বলা মুশকিল। দীপাদিহি থেকেই হয়ত। তেবারিয়া প্রায় দেড় মাইল দূরে।

এখন আর মেয়েটির চিৎকার শোনা যাচ্ছে না।

কিন্তু অকস্মাৎ নিস্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করে এল. এম. জি-র. একটানা ঠা ঠা ঠা শব্দ।

ধক্ করে উঠল বুকটা কামালের। রাসেল বোধহয় ধরা পড়েছে।

আর কোন শব্দ নেই। আবার নেমে এসেছে নিঃস্তব্ধতা! চঞ্চল হয়ে উঠল কামাল। কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু রাসেল নির্দেশ দিয়ে গেছে রাত দুটোর প্রোগ্রাম বাস্তবায়িত করতে। রাসেলের নির্দেশ অমান্য করে কি নদীর ওপারে এই মুহূর্তে যাওয়া উচিত হবে?

দ্রুত বয়ে যাচ্ছে সময়। এখুনি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অন্তত রাসেলের লাশটা উদ্ধার করার চেষ্টা করতে পারে না কি ওরা?

তিন

নদী পেরিয়ে সরাসরি তীরে না উঠে দীপাদিহি মসজিদে ঢুকে পড়েছে সিঁড়ি টপকে রাসেল। নদী থেকেই উঠে গেছে সিঁড়ির ধাপ। মসজিদে ঢুকে নাইট বায়নোকুলার দিয়ে আশপাশটা ভাল করে দেখে নিয়ে এগোবার রাস্তা ঠিক করে নেয় ও।

দক্ষিণমুখো মসজিদ। পুবদিকের দেওয়ালের পাশ দিয়ে চলে গেছে গরুর গাড়ি চলাচলের উপযুক্ত মেঠো পথ। অদূরেই একটি চারকোণা পুকুর। পথটা এসেছে নৈহাটি থেকে।

দীপাদিহি এবং তেবারিয়ার প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় নৈহাটি। নৈহাটি কোন গ্রাম নয়। হাট। মঙ্গল এবং শনিবার হাট বসে। গত মাস তিনেক অবশ্য হাট বসেনি।

নৈহাটি থেকে অনেকটা দক্ষিণে কৃষ্ণপুর। বেশ বড় গ্রাম।

দীপাদিহি থেকে তেবারিয়া যাবার পথটা সহজ এবং অনেকটা নিরাপদ। চওড়া মেঠো পথ ছাড়াও জঙ্গল আছে। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে অনায়াসে এগিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু মনটা কেমন যেন খুঁতখুঁত করতে লাগল রাসেলের। নৈহাটিই ওকে টানছে।

দীপাদিহি জ্বালিয়ে দিয়েছে শত্রুরা। বাঙ্কার করে ছিল গত পরশু অবধি। কিন্তু পিছিয়ে গিয়ে এখন আছে তেবারিয়ায়। অথচ মেয়েটির চিৎকার অতদূর থেকে আসতে পারে না। বড়জোর নৈহাটি হাট থেকে চিৎকার ভেসে আসতে পারে। নৈহাটির দিকেই যাবে ঠিক করল রাসেল।

চওড়া মেঠোপথের পাশে দুটো মাত্র বাড়ি। লোকজন নেই। একটি খেজুর গাছ রাস্তার ওপরই। কিন্তু রাস্তার পাশে ঘন লম্বা লম্বা ঘাস।

ঘাসের রাজ্য থেকে মিনিট পাঁচেক পর বেরিয়ে আসে রাসেল। স্টেনগানটা শক্ত করে ধরা। বায়নোকুলার দিয়ে অদূরবর্তী হাটটা দেখতে গিয়েই পিছিয়ে আসে ও দ্রুত।

হাটের একটি দোকানের দরজা খোলা। দোকানে কয়েকজন লোক বসে রয়েছে। কিছু একটা করছে তারা। সম্ভবত মেয়েটির সর্বনাশই করছে। কিন্তু তা দেখে পিছিয়ে আসেনি রাসেল।

একজন লোক তীরবেগে ছুটে আসছে দূরের পথ দিয়ে। প্রায় শ দুয়েক গজ দূরে লোকটা। ছুটে আসছে না, যেন উড়ে আসছে। সাদা শার্ট এবং ঢোলা সালোয়ার পরনে লোকটার। নিশ্চয়ই পাঞ্জাবী সেনা, সিভিল ড্রেসে।

আরও পিছিয়ে গেল রাসেল। ব্যাপার কি? শত্রুদের মধ্যে এমন চঞ্চলতার কারণ?

পদশব্দ এবার শোনা যাচ্ছে।

ঘাসের ভিতর ঢুকে পড়েছে রাসেল। হাটের মধ্যবর্তী দোকানটার ভিতরকার

লোকগুলো শুনতে পেয়েছে পদশব্দ। দোকানটার মাঝখানে অদৃশ্য হয়ে গেল তারা। ট্রেঞ্চ আছে দোকানটার ভিতরে।

তীরবেগে ছুটে আসছে লোকটা হাটের দিকে। হাটের ভিতর ঢুকেই লোকটা চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল একটি দোকানের ভিতর। শেষ মুহূর্তে তার হাতে একটি এল. এম. জি. দেখল রাসেল। রহস্যময় ব্যাপার। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় কি। হঠাৎ দেখা গেল আরও দুজন লোককে। একই পথে ছুটে আসছে দুজন লোক সবেগে।

প্রথম লোকটা হাটের প্রথমভাগের একটি দোকানে আত্মগোপন করে রয়েছে। তাকে ধরার জন্যেই সম্ভবত অপর লোক দুজন ছুটে আসছে।

নাইট বায়নোকুলার দিয়েও ভাল দেখতে পাচ্ছে না রাসেল। অস্পষ্ট যা দেখা যাচ্ছে তাতে বোঝা যায় যে এ-লোক দুজনও পাঞ্জাবী। সাদা পোশাক পরা।

আত্মগোপনকারী লোকটার প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে লোক দুজন। ওদের হাতে চায়নিজ স্টেনগান।

অকস্মাৎ আত্মগোপনকারী লোকটা আড়াল থেকে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল পিছু ধাওয়ারত লোক দুজনার উপর।

চোখের পলকে ধরাশায়ী হলো লোক দুজন। প্রথম লোকটার শক্তি-সামর্থ্য অন্য দুজনার তুলনায় অনেক বেশি। প্রথম ব্যক্তি তার শত্রুর একজনের তলপেটে প্রচণ্ড এক লাথি মেরেই দ্বিতীয়জনের নাক বরাবর ভীষণ এক ঘুসি চালাল।

লাথি খেয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিটকে পড়ল দূরে। নড়াচড়া করতে দেখা গেল না আর তাকে। তৃতীয় লোকটার বুকে চেপে বসেছে প্রথম লোকটি।

দূর থেকে পরিষ্কার দেখা না গেলেও রাসেল বুঝতে পারল প্রথম লোকটি তার শত্রুর গলা টিপে ধরেছে বজ্রমুষ্টিতে। আক্রান্ত লোকটি চেষ্টা করছে নিজেকে মুক্ত করতে। কিন্তু ব্যর্থ সে চেষ্টা।

একমিনিট পরই উঠে দাঁড়াল প্রথম লোকটি। এগিয়ে গেল সে তার দ্বিতীয় শত্রুর দিকে।

লাথি খেয়ে লোকটা পড়ে গেছে। পড়েই আছে। তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল প্রথম লোকটা। অকস্মা' এল. এম. জি.র নল দিয়ে তীব্রবেগে ঘা মারল সে তার শত্রুর মাথায়।

ঘুরে দাঁড়াল এবার লোকটা। পিছন দিকে, দূরে, তাকাল সে একবার। তারপর সামনের দিকে পা বাড়াল।

এগিয়ে আসছে লোকটা এদিকেই।

এদিকে হাটের মধ্যবর্তী দোকানটার ট্রেঞ্চের ভিতর থেকে তিনজন পাঞ্জাবী সৈন্য বেরিয়ে এসেছে। ক্রলিং করে দোকানের বাইরে বেরিয়ে আসছে এবার তারা।

সাদা পোশাক পরা লোকটা দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে। সে দেখতে পাচ্ছে না

সেনাগুলোকে। সেনা তিনজন ক্রলিং করে অনেকটা এগিয়ে এসে হাটের মাঝখান দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে তার সামনে একটি দোকানের আড়ালে এসে থামল। দ্রুত অগ্রসরমান লোকটি সেই পথেই এগিয়ে আসছে। আর মাত্র কয়েক পা। মুখোমুখি হবে ওরা।

'হল্ট!'

খান-সেনাদের একজন আদেশ করল। রাস্তার পাশে তারা তিনজন। রাস্তার উপর লোকটা।

বিদ্যুৎ খেলে গেল রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে পড়া লোকটার শরীরে। হল্ট শব্দ কানে ঢোকার সাথে সাথে থমকে দাঁড়িয়েছিল সে। তারপর মাত্র এক সেকেন্ডের বিরতি। পরের সেকেন্ডেই দেখা গেল ঘুরে দাঁড়িয়েই এল. এম. জি.-র ব্রাশ ফায়ার করছে সে।

মনে মনে লোকটার বিদ্যুতগতির প্রশংসা না করে পারল না রাসেল। অদ্ভুত ক্ষমতা।

এক ব্রাশ ফায়ারেই তিনজন খান-সেনা খতম হয়ে গেছে।

পরিষ্কার হচ্ছে না ব্যাপারটা। শত্রুদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে নাকি?

লোকটা দেরি করল না। আবার দ্রুত এগিয়ে আসছে সে। এবার সে সরাসরি চওড়া মেঠোপথের দিকে অর্থাৎ রাসেলের দিকে এগিয়ে আসছে।

তৈরি হয়েই আছে রাসেল। চোখ-কান অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠল। শত্রু অদ্ভুত কৌশলী এবং শক্তিধর। মনে মনে নিজেকে হুঁশিয়ার করে দিল রাসেল—সাবধান, রাসেল!

লোকটাকে থামার নির্দেশ দেয়াটা মারাত্মক আত্মঘাতী। নির্দেশ শুনে এক সেকেন্ডের মধ্যেই শব্দের উৎসের দিকে ব্রাশ ফায়ার করবে সে। অন্য উপায় দরকার।

কিন্তু লোকটাকে ধরে লাভই বা কি?

দ্রুত ভেবে নিল রাসেল। লাভই বেশি। রহস্যময় ব্যাপারটা জানা যাবে। শত্রু-সেনাদের ঘাঁটি সম্পর্কে তথ্য আদায় করা যাবে। সর্বোপরি একজন পরম শত্রুকে নরকে পাঠানো যাবে।

লোকটা লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে। মাত্র কয়েক হাত দূরে সে।

নিঃশব্দে বিড়ালের মত বেরিয়ে এল রাসেল ঘাসের রাজ্য থেকে। স্টেনগানের নলটা লোকটার শির দাঁড়ায় ঠেকিয়ে চাপা কণ্ঠে নির্দেশ দিল ও, 'স্টপ্!'

থমকে দাঁড়াল লোকটা। পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল তার সর্ব শরীর।

পরমুহূর্তে ভারি গলার হাসি শোনা গেল।

'মি. কুয়াশা! আপনি।'

অবিশ্বাস ভরে বলে উঠল রাসেল। বিস্ময় বাধ মানছে না রাসেলের। গতকাল কুয়াশা ছিল পাঁচ ছয় মাইল পুবে আর আজ সে নৈহাটিতে।

'হ্যাঁ। আমি কুয়াশা। তুমি একা নাকি?'

রাসেল সামলে নিল নিজেকে দ্রুত। বলল, 'একাই। কিন্তু আপনি কেন এদিকে?'

কুয়াশার চোখমুখ গম্ভীর হয়ে উঠল একটু। বলল, 'আর বলো না, ভাই! শহীদকে খবর দিতে এসে আটকা পড়ে গেছি। শত্রু এলাকার ভিতর দিয়ে পথ করতে পারছি না কোন মতে। অথচ ফিরতেই হবে আমাকে। তা না হলে আমার অনুচররা শত্রু বাহিনীর ঘাড়ের ওপর দিয়ে ঝড়ের বেগে আমার খোঁজে এসে পড়বে। সেটা আমি চাই না। শত্রুপক্ষ প্রথমে তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী মুক্তাঞ্চলের ওপর আক্রমণ করুক আগে। তারপর আমরা পিছন থেকে···সে যাকগে। শহীদকে খবরটা দিয়েছিলে?'

রাসেল বলল, 'দিয়েছিলাম। কিন্তু সে কথা পরে। আমার প্রশ্নের উত্তর দিন, দয়া করে। ছুটে আসছিলেন কেন আপনি?'

'ডিনামাইট ফিট করে পালিয়ে আসছিলাম। ওদের ঘাঁটির বড় অংশটা উড়ে যাবে এখুনি। সলতেতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে এসেছি। একজন দেখে ফেলেছিল। তাকে শেষ করে এসেছি। কিন্তু লাশটা দেখে ফেলেছে কেউ। তাই দুজন পিছু ধাওয়া করেছিল।'

রাসেল বলে, 'একটি মেয়ের চিৎকার শুনে আমি ওপার থেকে···।'

বাধা দিয়ে কুয়াশা বলে, 'আমিও শুনেছি মেয়েটির চিৎকার। আরও মেয়ে ছিল ওখানে। এই মেয়েটি কেমন করে জানি না পালিয়ে চলে এসেছিল। তাকে আবার ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

চোখমুখ গম্ভীর এবং কঠিন আকার ধারণ করল রাসেলের। বলল, 'ঘাঁটিতেই ধরে নিয়ে গেছে তাহলে মেয়েটিকে? ঘাঁটি তো উড়ে যাবে। মেয়েটি?'

কুয়াশা বলল, 'উপায় ছিল না। চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু পারলাম না ওকে বের করে আনতে।'

রাসেল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, 'এরকম অন্যায় আপনার অতীত জীবনের প্রায় প্রতিটি কাজেই ছিল, মি. কুয়াশা! প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ হরণই করলেন চিরকাল। প্রাণের কোন মূল্য আপনি দেন না। যদি দিতেন তাহলে আমরা দস্যু বিপথগামী কুয়াশাকে পেতাম না। পেতাম প্রতিভাবান একজন বিশ্ব বিখ্যাত মানব প্রেমিক বিজ্ঞানীকে।'

'তুমি কালকের ছেলে। সব কথা বোঝো না। এখনও সেন্টিমেন্টের দাম দাও তুমি। তিনটে মেয়ে ছিল ওখানে। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি আমি। দুজনকে মুক্ত করে নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু বাকী একজনকে মুক্ত করতে গিয়েও পারলাম

না। ইচ্ছা করলে প্রথম সুযোগেই শত্রু এলাকা ছেড়ে আমার এলাকায় চলে যেতে পারতাম আমি। তা যাইনি। শুধু মাত্র ওই একটি মেয়ের জন্যে।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল কুয়াশা।

তারপর বলল, 'মেয়েটি মারা যাবে। দুঃখ হচ্ছে আমার। কিন্তু আমি বাস্তববাদী। একটি মেয়ের বদলে প্রায় দেড়শো শত্রুকে খতম করার ব্যবস্থা করেছি। যথেষ্ট নয়? এটা যুদ্ধ। কথাটা ভুলে যেয়ো না রাসেল।'

কুয়াশার কথাগুলো যুক্তিপূর্ণ। অস্বীকার করতে পারল না রাসেল।

চার

তেবারিয়ার শত্রু ঘাঁটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হলো ঠিক। কিন্তু পরদিনই আবার নতুন একদল শত্রু ঘাঁটি করল নৈহাটিতে। সংখ্যায় তারা পাঁচ শোরও বেশি।

শহীদ ডেকে পাঠাল পরদিন দুপুরে রাসেলকে। কিন্তু মহা সমস্যায় পড়ে গেছে রাসেল। তেবারিয়ার শত্রু ঘাঁটির উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসছিল বিরাট আর এক শত্রু বাহিনী। তারা পৌঁছেছে সেদিনই সকালে। তেবারিয়ার ঘাঁটি নিশ্চিহ্ন দেখে তারা কামান, মর্টার ছুঁড়তে ছুঁড়তে নৈহাটিতে এসে ঘাঁটি করেছে। কিন্তু গোলাগুলি বর্ষণ থামেনি। অবিরাম চলেছে। পাল্টা জবাব দিচ্ছে সাদেক এবং জজ।

আসলাম সাদেক এবং জজকে রেখে যেতে বলেছে শহীদ। শত্রুবাহিনীর মতিগতি খুব খারাপ। ওরা তিনজন কি করবে? অতশত ভাবলে চলে না। দুপুরে মুষলধারে গোলাগুলি বৃষ্টির ভিতরই ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে পড়ল ওরা।

ক্রলিং করে মাইল খানেক এগোতে হলো। রাজনগরের বাড়ি কয়টা ধ্বংস হয়ে গেছে। কাতলি বাজার, শাস্তা, শিকারপুর, রামচন্দ্রপুর মসজিদ সহ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত কামানের গোলায়।

লাকসামপুরের অবস্থা এক কথায় ভয়াবহ। একটি কুঁড়ে ঘরও অবশিষ্ট নেই। শহীদ বলল, 'গতরাতে গোরপাড়ায় গিয়ে শত্রুদের ঘাঁটিতে আক্রমণ চালানো হয়েছিল! শত্রুদের পঞ্চাশ ভাগ শক্তি নষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু এখনও ওদের লোকসংখ্যা, অস্ত্রশস্ত্র আর গোলা বারুদ প্রচুর।'

রাসেল জিজ্ঞেস করল, 'অন্যান্য ফ্রন্টের অবস্থা কি?'

শহীদ বলল, 'একই রকম। প্রায় প্রতিটি শত্রু ঘাঁটিতেই গতরাতে আক্রমণ চালানো হয়েছে। আংশিক সাফল্য এসেছে সব জায়গায়। কিন্তু তারপর থেকেই ব্যাপক আক্রমণ শুরু করেছে ওরা। তোমাদের ওদিকের খবর কি?'

রাসেল সব কথা খুলে বলল।

দুপুরের শেষদিকে খবর এল দক্ষিণে যশোর ধরে শত্রু বাহিনীর বিরাট একদল বেনাপোলের দিকে এগোচ্ছে। ওখানে কমান্ডার সৈয়দ তার দলবল নিয়ে আছে।

শহীদ মন্তব্য করল, 'মাত্র নয়জন ওরা। টিকতে পারবে বলে মনে হয় না।'

রাসেল বলল, 'আমি যাব?'

শহীদ বলল, 'এতটা পথ পেরোতে সময় লাগবে অনেক। তুমি পৌছে দেখবে যা হবার হয়ে গেছে। তাছাড়া এই এলাকা মুক্ত রাখার জন্যে কাজ করতে হবে আমাদের?'

রাসেল পকেট থেকে ম্যাপ বের করে বলল, 'সেক্ষেত্রে আমাদের প্রথম কাজ হরিণদিয়ার ওখানে বেতনা নদীর ওপার পাকা ব্রিজটার দিকে নজর রাখা। দরকার হলে উড়িয়ে দেব ওটা।'

শহীদ বলল, 'আমিও তাই ভেবেছি।'

এক সঙ্গে দুটো স্যাবর জেট উড়ে এল সীমান্তের দিক থেকে।

হতবাক হয়ে গেল ওরা। পাকিস্তানী স্যাবর জেট সীমান্তের দিক থেকে আসার মানে? মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল ওরা।

হঠাৎ জ্বলে উঠল রাসেলের দুটো চোখ। বলে উঠল, 'এর একটাই ব্যাখ্যা আছে। বেনাপোল পর্যন্ত শত্রু আক্রমণ চালিয়েছে। ওখানে বোমা ফেলে তে-কোণা পথে ফিরে যাচ্ছে। মুক্তাঞ্চলের অবস্থা জরিপ করে নিচ্ছে নিশ্চয়ই।'

সন্ধ্যার আগেই শহীদ প্রতিটি ফ্রন্টে খবর পাঠাল বিচ্ছিন্ন মুক্তি বাহিনীকে মাত্র দুটো দলে একত্রিত হতে।

বেনাপোলের কাছাকাছি অবস্থানরত মুক্তি বাহিনী যোগ দেবে বেনাপোলস্থ মুক্তি বাহিনীর সাথে।

এদিক করালকালিপার, বসন্তপুর এবং বাঁশবাড়িয়ার মুক্তি সেনারা যোগ দেবে লাকসামপুরে শহীদদের সাথে।

সবাইকে নিয়ে শহীদ শিকারপুরে গিয়ে ঘাঁটি করবে স্থির হলো। যুদ্ধই মুক্তির উপায়। যুদ্ধ করেই ঠেকাতে হবে শত্রুকে। পালাবার রাস্তা হয়ত এখনও খুঁজে নেয়া যায়। কিন্তু পালাবে না ওরা।

হরিণদিয়া গ্রামটা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে। গ্রামটার উপর দিয়েই চলে গেছে পাকা রাস্তাটা। আধ মাইলটাক উত্তরে গেলেই নদী। ব্রিজটা সেখানেই।

সন্ধ্যার পরপরই ব্রিজ উড়াবার সব ব্যবস্থা করে নদীর এপারের ঘন ঘাস বনে ফিরে এল রাসেল।

ঘাসের আড়ালে যন্ত্রপাতি লুকিয়ে রেখে এখন কেবল অপেক্ষার পালা।

কামাল ছাড়া বাকী সকলকে শিকারপুরে পাঠিয়ে দিয়েছে রাসেল।

শহীদ রাতটুকু হয়ত লাকসামপুরে থাকবে। মুক্তি সেনারা লাকসামপুরে জমায়েত হবে আজ রাতের মধ্যেই। তাদেরকে নিয়ে শিকারপুরে যাবে শহীদ!

জীবন-মরণ যুদ্ধ হবে শিকারপুরেই। এটা জলের মতই পরিষ্কার। রাত সাতটার পর স্থির থাকতে পারল না রাসেল। যেভাবেই হোক বিশাল শত্রু বাহিনীকে ঠেকাতে হবে।

কিন্তু সম্ভাব্য ঘটনা ঘটার বদলে অসম্ভব ঘটনা ঘটে গেল।

রাত আটটায় হরিণাপোতা, মাদারতলা এবং রাহিলীপোতা থেকে গ্রামবাসীরা পালিয়ে এল। গ্রামগুলোকে শত্রুপক্ষের কামানের গোলা বিধ্বস্ত করেছে।

কিন্তু তাদের পালিয়ে আসার কারণ তা নয়। তারা খবর পেয়েছে বেনাপোল দখল করে শত্রুবাহিনী সীমান্ত ঘেঁষে সাদীপুর, রঘুনাথপুর, কাতরাপাড়া পর্যন্ত পৌঁছেছে। তারপর সেখান থেকে আড়াআড়ি ভাবে রওনা হয়েছে শঙ্করীপোতা হয়ে রাহিলীপোতার দিকে।

ঘটনাটা অবিশ্বাস করার মত নয়। শুনেই বুঝতে পারল রাসেল শত্রুপক্ষের উদ্দেশ্য। মুক্তিবাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করতে চায় তারা মুক্তাঞ্চলকে দুইভাগে ভাগ করে। মাঝখানে ঘাঁটি করবে তারা। এদিকে পালাবার পথও বন্ধ করে দিয়েছে। সীমান্তের দিকে শত্রু। বেতনা নদীর তীর বরাবর শত্রু। যশোর রোডও ওদের হাতে।

মহুয়া ভাবী এবং লীনাদের কথা মনে পড়ল প্রথমেই। কামাল মাথার চুলে ঘনঘন আঙ্গুল চালাচ্ছে। কপালের দুই পাশের শিরাগুলো উঁচু হয়ে উঠেছে তার। যশোর রোড থেকে মাত্র আড়াই তিন মাইল উত্তরে ন্যাটাডিঙি পাড়া। রাহিলীপোতা থেকে বড় জোর সাড়ে তিন মাইল। মানে মহুয়াদের বিপদ দুই দিক থেকে।

রাত বারোটার দিকে খবর পাঠাল শহীদ—শিকারপুর আক্রমণ করেছে শত্রুপক্ষ। তুমুল যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যবর্তী স্থান নদী পেরিয়ে শহীদ এবং আসলাম গেছে ওপারে।

বুঝতে বাকি রইল না রাসেলের যে শহীদ মুক্তাঞ্চলকে রক্ষা করার শেষ চেষ্টায় নেমেছে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে।

সবাই যুদ্ধে লিপ্ত। এদিকে অপেক্ষার পালা ওর। অস্থির হয়ে উঠল রাসেল। গরুর গাড়ি নিয়ে আবার ও সোনাদিয়ার শেষ প্রান্তে চলে এল।

ব্রিজের খানিকটা পিছনে ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছে।

কোন কাজ হবে না ব্যারিকেডে। জানে রাসেল। এবং কাজের আশায় এতটা পরিশ্রমও করেনি ও। শত্রুপক্ষকে ভুল ধারণা দেবার জন্যেই তৈরি করা হলো ব্যারিকেড।

ব্রিজ উড়িয়ে দিলেও ওরা বসে থাকবে না। ঘন্টা কয়েকের মধ্যে অস্থায়ী ব্রিজ তৈরি করে নেবে ওরা। ব্রিজ পেরিয়ে ব্যারিকেড দেখবে। পুড়িয়ে ফেলবে ব্যারিকেড। সামনে আর কোন বাধা না দেখে এগিয়ে আসবে শত্রুপক্ষের সাঁজোয়া গাড়িগুলো, ট্রাকগুলো, ভ্যানগুলো, জীপগুলো।

ব্যারিকেডের পিছনে রাস্তার উপর পোঁতা হলো মাইন।

রাত দুটো। শরশর করে শব্দ হচ্ছে পিছনে। স্টেনগান তুলে নিল রাসেল। পিছন দিকে ঘুরে বসল।

ঘাসের বনের ভিতর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে কেউ। পাশ কেটে চলে যাচ্ছে। শিয়াল নয়ত?

ঘাস থেকে বেরিয়ে ফাঁকা জায়গায় এল একটি ছায়ামূর্তি। শিয়াল নয়। কুয়াশা। নক্ষত্রের মৃদু আলোতেও চিনতে পারল রাসেল।

'মি. কুয়াশা।'

ডাকল রাসেল। থমকে দাঁড়াল কুয়াশা। কুয়াশার কাঁধে বড় এবং ভারি একটি চটের বস্তা।

'ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন?'

শুয়ে পড়ল রাসেল ঘাসের আড়ালে। ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে কুয়াশাকে।

পাঁচ হাত দূরেই কামাল। কামালকে দেখতে পাচ্ছে না রাসেল। প্রায় তিন হাত উঁচু ঘন ঘাসের আড়ালে কামালও লুকিয়ে আছে।

এগিয়ে আসছে কুয়াশা। ঘাসের রাজ্যের সামনে এসে দাঁড়াল সে। বলল, 'কি করছ তোমরা এখানে?'

'ব্রিজটাকে পাহারা দিচ্ছি।'

বলল রাসেল, 'ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন এমন সময়?'

কুয়াশা বলল, 'ব্রিজটাকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাই।'

অন্ধকারে একটু হাসল কুয়াশা। যোগ করল, 'বাধা দেবে নাকি?'

'হ্যাঁ।'

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল রাসেল অন্যমনস্কভাবে। বুকের ভিতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ওর চোখ দুটো, 'ব্রিজ ওড়াবার দরকার হলে আমরাই আছি।'

হঠাৎ কুয়াশা তার হাতঘড়িটা তুলে ধরল কানের কাছে। মনোযোগের সাথে কি যেন শুনছে সে।

মিনি অয়ারলেসে ভেসে আসছে স্যানন ডি. কস্টার কণ্ঠস্বর, 'এনিমি অ্যাটাক করিয়াছে। ফ্রী-এরিয়া বিপদ গ্রস্ট। হাপনি কোঠায় বস্?'

'কে কথা বলছে?'

কুয়াশা তাকাল। বলল, 'ডি. কস্টা। শত্রুপক্ষ তাদের চরম আঘাত হেনেছে মুক্তাঞ্চলের উপর।'

পাঁচ

রাত আড়াইটায় শহীদের সাথে শিকারপুর রণাঙ্গনে দেখা করল রাসেল।

তুমুল যুদ্ধ চলছে। নদী পেরিয়ে আসলামকে নিয়ে কৃষ্ণপুর অবধি গিয়েছিল শহীদ। কিন্তু সুবিধে করতে না পেরে ফিরে এসেছে ওরা।

নদী পেরোবার চেষ্টা অবশ্যি শত্রুপক্ষ করছে না। কিন্তু বিপদ আছে অন্যখানে।

গোলাবারুদ এবং লোকসংখ্যা শত্রুবাহিনীর প্রচুর। মুক্তি সেনারা সংখ্যায় নগণ্য এবং অবিরাম এইভাবে যুদ্ধ করতে হলে চাই অফুরন্ত গোলাবারুদ। কিন্তু গোলাবারুদ যা আছে তা আগামীকাল সকাল অবধি চলতে পারে।

ট্রেঞ্চের ভিতর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ অবস্থা লক্ষ্য করতে করতে রাসেল বলল, 'এখানের দায়িত্ব আমাকে ছেড়ে দিয়ে আপনি বরং কয়েকজন নিয়ে ন্যাটাডিঙিতে একবার যান।'

চমকে উঠতে দেখল রাসেল শহীদকে।

'কি ব্যাপার?'

জিজ্ঞেস করল রাসেল।

শহীদ হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বলল, 'ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। ওদের কথা ভুলেই গেছি আমি।'

একমুহূর্ত পর শহীদ বলল আবার, 'কিন্তু আমার তো যাওয়া হবে না, ভাই। এরকম ভয়ঙ্কর অবস্থায় তোমাদেরকে রেখে যাব, তা হতেই পারে না।'

রাসেল বলল, 'খুব হতে পারে। মহুয়া ভাবীরা নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্যের আশায় অপেক্ষা করছেন।'

'কুয়াশার খবর জানো?'

রাসেল উত্তরে বলল, 'কোথায় গেলেন বলে যাননি। কিন্তু আপনি আর এক মুহূর্তও দেরি করবেন না, শহীদ ভাই। এখুনি কামাল ভাই এবং আরও দুজনকে নিয়ে যাত্রা করুন। শত্রুরা রাহিলীপোতা অবধি পৌছে গেছে। বলা যায় না, হয়ত ন্যাটাডিঙিতেও পা দিয়েছে ইতিমধ্যে।'

'কিন্তু এ অসম্ভব, রাসেল। আমাকে তুমি অশান্ত করে তুলো না। তাছাড়া ওরা হয়ত ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। গিয়ে দেখব…।'

রাসেল জোর দিয়ে বলল, 'অনুমান করে কিছু না বলাই ভাল। দিন, আপনার স্টেন দিন।'

প্রায় জোর করে শহীদের হাত থেকে স্টেনগানটা নিজের আয়ত্তে আনল রাসেল। বলল, 'কামাল ভাই একা আছেন-হরিণদিয়ায়। ওকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত। ওর জায়গায় আর কাউকে রাখলেই চলবে।'

সিদ্ধান্ত নেবার অবকাশও দিল না রাসেল শহীদকে। দুই হাত দিয়ে কোমর ধরে ট্রেঞ্চের উপর তুলে দিল শহীদকে ও।

ডাক্তার বললেন, 'মহুয়া ভাবী, আপনি এদিকটা দেখাশোনা করুন। আমি দু'চারজন লোক পাওয়া যায় কিনা দেখি।'

'দেরি করবেন না কিন্তু।'

লীনা বলল কথাটা।

'না না!'

দ্রুত বেরিয়ে গেল ডাক্তার স্টেনগান নিয়ে। হাসপাতালের গেট অতিক্রম করে।

মহুয়ার পাশে খবির বসে রয়েছে। কয়েক মাস চুলদাড়ি ছাঁটেনি ও। স্টেনগানগুলো দ্রুত পরিষ্কার করছে সে। বারান্দা থেকে লীনা খোলা দরজা দিয়ে একটি কামরায় প্রবেশ করল।

পঙ্গু মুক্তি সেনারা সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে সবাই। বসে থাকার সময় নেই। সময় নেই শুয়ে থাকার। শরীরে ক্ষমতা থাক বা না থাক, চেষ্টা করতে হবে শত্রুকে বাধা দেবার।

খবিরের একটা পা নেই হাঁটু অবধি। ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থাতেই উঠে পড়েছে সে। মহুয়া কোন আপত্তি করতে পারেনি। কোথা থেকে একটা বেয়োনেট লুকিয়ে রেখেছিল বিছানার নিচে। সেটা বের করে খবির বলে উঠেছিল, 'মহুয়া আপা, আমি কিন্তু আর সকলের মত যুদ্ধ করার জন্যে পালিয়ে যাচ্ছি না। যুদ্ধ আমি এখানেই করব, শত্রু যদি আসে। কিন্তু সে অনুমতিও যদি আপনি না দেন তাহলে নিজের বুকে এই বেয়োনেট...।'

আপত্তি করতে পারেনি মহুয়া। ডাক্তার অবশ্যি রাজি হতে চাননি। তিনি বলেছিলেন বুঝিয়ে শুনিয়ে বেয়োনেটটা আদায় করে নিয়ে ধমক দিয়ে শান্ত করবেন খবিরকে। ডাক্তারকে বুঝিয়েছে মহুয়া। শেষ অবধি মহুয়ার কথাই মেনে নিয়েছে ডাক্তার।

খবিরের দেখাদেখি আহত মুক্তিসেনারা প্রায় প্রত্যেকেই উঠে পড়েছে বিছানা ছেড়ে।

কারও হাত নেই, কারও পা নেই, কারও উরুতে এখনও বুলেট রয়েছে—তারা সবাই কাজ করছে।

দুপুর হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার ফিরছে না কেন বুঝতে পারল না মহুয়া।

বেলা একটার দিকে হাসপাতালের পঁচিশ গজের মধ্যেই পড়ল দুটো কামানের গোলা। সামনের পাঁচিলের ক্ষতি হলো খানিকটা।

রাহিলীপোতা যে শত্রুদের দখলে চলে গেছে তা অনুমান করতে কষ্ট হলো না কারও।

কুয়াশা বা শহীদের কাছ থেকে সাহায্যের আশা করা বৃথা। কথাটা ভাল করেই বুঝল মহুয়া।

কিন্তু লীনা ছেলে মানুষ। তাকে আশ্বাস দিয়ে দিয়ে রাখছে মহুয়া।

দুপুরের দিকে মহুয়া বলল, 'তোর দাদা হয়ত বিকেলের মধ্যেই এসে পৌছবে, কি বলিস?'

'মনে হয় না।'

লীনা বলল, 'শহীদদা আসবে কিভাবে শুনি? রাস্তা কোথায়? রাহিলীপোতায় খান-সেনারা পৌঁছে গেছে। ওদেরকে কাবু করে এখানে পৌঁছতে কয়েকদিন সময় লাগবে।'

মিসেস রহমান বললেন, 'তাহলে আমাদের কি হবে?'

মহুয়া এবং লীনা বিপদের মুখোমুখি এর আগেও হয়েছে বহুবার। বিপদে পড়ে অস্থির বা বিমূঢ় হয়ে পড়ে না ওরা সহজে। মিসেস রহমানের পূর্ব-অভিজ্ঞতা নেই। অনেকটা সামলে নিলেও পুরোপুরি স্থির থাকতে পারেন না তিনি। জিঞ্জিরার ঘটনাচক্র থেকে তিনি মহুয়াদের সাথে জড়িত হয়ে পড়েছেন। স্বামী মারা গেছেন যুদ্ধক্ষেত্রে মাত্র মাস দেড়েক আগে। কিন্তু খবরটা মহুয়া দেয়নি মহিলাকে।

হাসপাতালের আহত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা সকাল অবধি কমে মাত্র পঁচিশে দাঁড়াল। যারা এক-আধটু হাঁটতে পারে তারা লুকিয়ে পালিয়ে গেছে।

দুপুরের পরে ঘটল সবচেয়ে মর্মান্তিক এবং নৈরাশ্যজনক ঘটনাটা।

সকাল থেকেই কামানের গোলা এসে পড়ছিল ন্যাটাডিঙিতে।

ট্রেঞ্চ কাটাই ছিল।

অপেক্ষা করছিল ওরা। ডাক্তার ফিরে এলেই ট্রেঞ্চে নামার কথা তুলত মহুয়া। মুক্তিবাহিনীর আহত ছেলেরাও যুদ্ধ করে মরতে চায়।

কিন্তু বেলা অনেক হয়ে গেল অথচ ডাক্তারের ফেরার নাম নেই।

গ্রামে লোকজন নেই। থাকলে ওরা টের পেত শত্রুর আগমন অনেক আগেই হয়েছে।

ডাক্তার যে আর ফিরে আসবে না তা ওরা হঠাৎ বুঝতে পারল গ্রামের দুদিকে আগুন জ্বলে উঠতে দেখে।

মহুয়াই দেখল প্রথমে আগুন। গ্রামের শেষ মাথায় হাসপাতালটা। পিছনে জলাভূমি। সামনে ফাঁকা মাঠ, জঙ্গল। তারপর গ্রাম।

গ্রাম জ্বলছে।

আগুন দেখার খানিক পর শোনা গেল স্টেনগানের শব্দ।

মানুষ মারছে না শত্রুরা। মারবে কাকে? এ অঞ্চলের লোকজন সবাই পালিয়েছে। বেশির ভাগ যুবক এবং কর্মক্ষম পুরুষ গেছে মুক্তিযুদ্ধে। জরাগ্রস্ত, অক্ষম যারা ছিল তারা আকস্মিক বিপদের মুখে কে কোথায় ছিটকে পড়েছে কে জানে।

আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে ঘরগুলোর দিকে বুলেট ছাড়ছে খান-সেনারা।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে পাঁচজন আহত মুক্তিসেনা নামল উঠনে।

এর নাম আত্মহত্যা।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবল মহুয়া। খবির চিৎকার করে উঠল, 'মহুয়া আপা, ঘরের ভিতরে চলুন।'

প্রত্যেকের হাতে স্টেনগান।

লীনা এবং মিসেস রহমান সাদেকের সাথে আছে পিছন দিকে।

মহুয়া কামরার ভিতর ঢুকে একটি জানালার পাশে দাঁড়াল। দরজার পাশে বসল খবির।

হাসপাতালের খোলা গেটটা দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। শত্রু ঢুকবে ওই গেট দিয়েই।

যুদ্ধ কি বলা যায় একে? ভাবল মহুয়া। খান-সেনারা দলে দলে আসবে ভারি অস্ত্র নিয়ে।

পনেরোজনের মত ওরা সব মিলিয়ে। কতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে পশু-শত্রুকে? গুলিইবা বেশি কোথায়?

ক্ষীণ একটা আশা এখনও জাগছে মহুয়ার মনে। নিশ্চয়ই অনেক আগে খবর পেয়েছে শহীদ এবং কুয়াশা। ওরা একজনও কি রওনা হয়নি ইতিমধ্যে?

বুকটা কেন যেন ভরে উঠতে চায় আশায় আশায়।

কিন্তু খাকি পোশাক পরা কয়েকজন খান-সেনাকে দেখা মাত্র সব আশা কর্পূরের মত উবে যায়।

গর্জে ওঠে ট্রেঞ্চের ভিতর থেকে মুক্তিসেনাদের স্টেনগান।

চোখের পলকে তিনজন খান-সেনা লুটিয়ে পড়ল গেটের সামনে।

শত্রুর লাশ পড়তে দেখে আচমকা সব ভুলে যায় মহুয়া। স্টেনগান তুলে গেটের দিকে গুলি চালায় সে।

ছয়

সামনে দুই মাইল নিচু জমি। অন্যান্য বছর এসময় ধান কাটা হয়ে যায়। এ বছর ধান ফেলানো হয়নি। খাঁ খাঁ করছে বিস্তৃত জলাভূমি।

জলাভূমি যেখানে শেষ সেখানেই শুরু রাহিলীপোতা গ্রাম। আন্দরপোতা এবং পায়রাখোপি হয়ে জলাভূমিতে নেমেছে শহীদ এবং কামাল।

জানা কথা রাহিলীপোতায় শত্রু আছে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে বোঝবার কোন উপায় নেই। ওদেরও সুবিধে আছে। জলাভূমিটা একেবারে ফাঁকা থাকা সত্ত্বেও শত্রু ওদেরকে দেখতে পাবে না।

ন্যাটাডিঙিতে তাড়াতাড়ি পৌঁছুনো দরকার। অন্য পথে গেলে দেরি হয়ে যাবে। তাছাড়া পথে প্রাকৃতিক বিপদের সম্ভাবনা প্রচুর।

এদিকে নিচু ভূমিতে চোরাকাদার কুয়া প্রচুর। দুই-চার হাত পর পরই চোরাকাদার ছোট ছোট কুয়া। কোন একটায় যদি পা পড়ে তাহলে প্রাণের আশা ত্যাগ করতে হবে।

এই বিশাল জলাভূমিটা সে বিপদ থেকে মুক্ত।

রাহিলীপোতা গ্রাম হয়ে ন্যাটাডিঙির দিকে এগোবার আরও একটি উদ্দেশ্য হলো

শত্রুদের শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। সম্ভব হলে আঘাত হানার ব্যবস্থাও করা যাবে।

এটা যুদ্ধ। এবং ওরা যোদ্ধা। যুদ্ধের সময় স্বজনের নিরাপত্তা বিধানের জন্যে সময় অপব্যয় করা যোদ্ধার আদর্শ নয়। তাছাড়া শহীদের মনে একটা ভরসা আছে। মহুয়া সাহসী এবং বুদ্ধিমতী মেয়ে। ধরা সে সহজে পড়বে না।

দ্রুত হাঁটছিল ওরা। কালো এবং সবুজ মিশ্রিত অদ্ভুত এক রঙের ইউনিফর্ম পরনে ওদের। হাতে হালকা মেশিনগান শহীদের।

কামালের হাতে একটি চায়নিজ স্টেন। গতমাসে এক শত্রু ঘাঁটি থেকে প্রচুর গুলি এবং চায়নিজ স্টেন হস্তগত করেছিল কামাল। ঘাঁটিটা কামাল একার চেষ্টায় ধ্বংস করেছিল।

আগে আগে হাঁটছে কামাল। দুজনারই পিঠে ম্যাগাজিন ভর্তি ঝোলা। গ্রেনেডগুলো অপর এক ঝোলার ভিতর। গলার সাথে ঝুলছে সেগুলো।

প্রায় শ'খানেক গজ সামনে উঁচু জমি। শহীদ পা চালিয়ে চলে এল কামালের পাশে।

'দাঁড়া। বসে পড়।'

কথাটা বলেই শুয়ে পড়ল শহীদ। শহীদকে অনুসরণ করল কামালও।

পকেট থেকে নাইট বায়নোকুলার বের করে সামনের উঁচু জমিটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলল শহীদ। কামালও বের করল নাইট বায়নোকুলার।

চাঁদ নেই আকাশে। কিন্তু নক্ষত্র আছে। নাইট বায়নোকুলারে পরিষ্কার দেখা গেল উঁচু জমিটার উপর নড়ছে দুটো মাথা।

ট্রেঞ্চের ভিতর থেকে বেরিয়ে আছে দুটো মাথা। নিশ্চয়ই আরও শত্রু আছে।

কামাল ফিসফিস করে বলে উঠল, 'আমাদেরকে দেখতে পেয়েছে বলে মনে হয়?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

শহীদ বলে।

অপেক্ষা সইছে না কামালের। চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছে লীনা, মহুয়ার মুখ। অস্থির, নিচু গলায় বলে উঠল ও, 'এগিয়ে যাই চল।'

এগিয়ে চলল ওরা ক্রলিং করে।

শিশির ভেজা নরম মাটির উপর দিয়ে বুকে ভর দিয়ে হেঁটে এগিয়ে চলেছে ওরা। পঁচিশ গজের মত এগোবার পর আবার ওরা থামল।

বায়নোকুলারে দেখা গেল সেই একই দৃশ্য। সম্ভবত ওদের দুজনকে শত্রু দেখতে পায়নি এখনও।

আবার এগোবার পালা। এবার আরও সতর্কতার সাথে, আরও ধীরে।

গাঢ় অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না কিছু। অস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে অদূরেই উঁচু

জমিটা। আর মাত্র বিশ গজ দূরে। অতি সন্তর্পণে আরও গজ তিনেক এগোল ওরা। কামালের গায়ে হাত রাখল শহীদ। থামার নির্দেশ।

দুজনেই বায়নোকুলার দিয়ে দেখে নিল শত্রুদ্বয়কে। বায়নোকুলার নামিয়ে ধরল যে যার অস্ত্র। ফিসফিস করে শহীদ বলল, 'ওয়ান, টু, থ্রী।'

গর্জে উঠল শহীদের লাইট মেশিনগান এবং কামালের স্টেন।

ব্রাশ ফায়ারের শব্দ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বায়নোকুলার তুলে নিল ওরা।

মাথা দুটো দেখা যাচ্ছে না আর। সম্ভবত ট্রেঞ্চের ভিতর পড়ে গেছে মুখ থুবড়ে। দূর থেকে ভেসে এল এল. এম. জি-র শব্দ। গ্রামের মাঝখান থেকে শত্রুপক্ষ ফাঁকা শব্দ করছে।

অদূরের শত্রুদের তরফ থেকে কোন সাড়াশব্দ আসছে না! দুজনই ছিল নাকি? দুজনই মারা গেছে?

শহীদ ভাবছিল।

কিন্তু কামালের ওসব চিন্তা নেই আর। ওর মাথায় একটাই চিন্তা, ন্যাটাডিঙিতে পৌঁছুতে হবে যেমন করেই হোক।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কামাল। অন্ধকারে শত্রু আছে কি নেই বোঝা মুশকিল। এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে চালাতে তীরবেগে সামনের দিকে ছুটতে শুরু করল ও।

লাফ দিয়ে উঠে পড়ল কামাল উঁচু জমিটায়। কয়েক সেকেন্ড পর উঠল শহীদ। কামাল ততক্ষণ নেমে পড়েছে ট্রেঞ্চে।

শত্রুর উত্তপ্ত বুকে পা রেখে কামাল গ্রামের দিকে গুলি শুরু করল।

সামনেই কয়েকটি কলা গাছ। একটি পেয়ারা গাছ। আরও সামনে পাতলা ঝোপ। তারপর একটি কুঁড়েঘর। কুঁড়েঘরের পর ছোট একটি ফাঁকা জায়গা। তারপর বেশ কয়েকটি বাড়ি। একটি পুকুর।

ফাঁকা জায়গাটিতেই ঘাঁটি করেছে শত্রুপক্ষ। শহীদ ধারণা করল।

কয়েকটা স্টেনগানের শব্দ দ্রুত এগিয়ে আসছে। ট্রিগারে আঙুল রেখে তৈরি হয়েই আছে ওরা।

কুঁড়ে ঘরটার কাছে আলো দেখা গেল। স্টেনগান থেকে বের হচ্ছে আগুনের আভা।

সেই আগুনের আভা লক্ষ্য করেই ট্রিগার টিপল শহীদ এবং কামাল।

আর্ত চিৎকার শুনে আনন্দে ভরে উঠল কামালের বুক। শত্রুদের গুলির শব্দ থেমে গেছে।

ট্রেঞ্চ থেকে উঠে পড়ছিল কামাল। এগিয়ে যাবার ইচ্ছা ওর। বাধা দি' শহীদ।

কেটে গেল কয়েকটি মিনিট। কোন সাড়া নেই শত্রুপক্ষের।

কামাল ট্রিগারে চাপ দিল। বেরিয়ে গেল এক ঝাঁক বুলেট।

তারপরই ওদেরকে চমকে দিল শত্রুপক্ষ।

একসাথে প্রায় পাঁচটা হেভি মেশিনগান গর্জে উঠল। কিন্তু এবার আগুনের আভা দেখা গেল না।

পাল্টা জবাব দিল কামাল এবং শহীদ।

কয়েক মুহূর্ত পর নেমে এল নিস্তব্ধতা। শত্রুপক্ষ সম্ভবত কুঁড়ে ঘরটার সামনে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে আড়াল থেকে গুলি চালাচ্ছে।

অকস্মাৎ ডান এবং বাঁ দিক থেকে গর্জে উঠল শত্রুপক্ষের স্টেনগান।

বুঝতে বাকী রইল না শত্রুপক্ষ ওদেরকে ঘিরে ফেলার মতলব এঁটেছে।

বায়নোকুলারে বিশেষ কিছু দেখা গেল না। তবে কুঁড়েঘরটার সামনে উঁচু মত কিছু একটা চোখে পড়ল। সম্ভবত পাথরের স্তূপ।

ঝোলা থেকে গ্রেনেড বের করল কামাল। দাঁত দিয়ে পিন খুলে নিয়ে সবেগে ছুঁড়ে দিল ও কুঁড়ে ঘরটার দিকে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দের সাথে সাথে চোখ ধাঁধানো আলোয় চারিদিক মুহূর্তের জন্য আলোকিত হয়ে উঠলো। পর মুহূর্তে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। তৃতীয়বারও তাই ঘটল।

আহত শত্রুর যন্ত্রণাক্ত কণ্ঠস্বর কানে এসে যেন মধুবর্ষণ করল। শহীদ ডান এবং বাঁ দিকে একটি করে গ্রেনেড ছুঁড়ে মারল।

সামনের শত্রুপক্ষ নীরব।

কামাল এক লাফে উঠে এল ট্রেঞ্চ থেকে। সারা শরীরে ব্যথা। ঘুম নেই আজ দুই তিন রাত। ঝিমঝিম করছে মাথার ভিতর। চোখ দুটোয় ভীষণ জ্বালা। কিন্তু এসব অনুভূতিকে গ্রাহ্য করার সময় নেই। এগিয়ে যেতে হবে। পৌঁছুতে হবে ন্যাটাডিঙিতে। লীনারা অপেক্ষা করছে বর্বর পশুদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে ওদের সাহায্যের আশায়।

ক্রলিং করে এগিয়ে যাচ্ছে কামাল। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই ওর। শহীদ পিছনে আছে কি নেই ভাবছে না ও। শত্রুর দিকেই খেয়াল ওর। শত্রুর সাড়া পেলেই শুধু থামবে ও।

ডান এবং বাঁ দিক থেকে গুলিবর্ষণ থেমে গেছে। কলাগাছগুলোকে বাঁয়ে রেখে পেয়ারা গাছটাকে ডানে রেখে ছোট ছোট পাতলা ঝোপের ভেতর দিয়ে কুঁড়ে ঘরটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। কামাল আগে। শহীদ একটু পিছনে।

হঠাৎ থামল কামাল। থামল শহীদও।

পরমুহূর্তে কামাল ছেড়ে দিল নিজের স্টেনগান। বাঁ হাতের কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে মাথা ও বুক উঁচু করে ডান হাত দিয়ে প্রচণ্ড ঘুসি চালাল ও অন্ধকারে। থ্যাচ।

আহত পশুর মত ককিয়ে উঠল একজন শত্রু। কামালের ঘুসি মোখম জায়গায় গিয়ে আঘাত হেনেছে। শত্রুর একটা চোখ ফেটে গেছে।

বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবার শহীদ। শত্রুদেরকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ওরা দুজন চার পাঁচজন শত্রুর মুখোমুখি পড়ে গেছে। ক্রলিং

করে তারাও এগিয়ে আসছিল।

কামাল উঠে দাঁড়িয়েই প্রচণ্ড এক লাথি চালাল আহত শত্রুর দিকে। সবুট লাথি গিয়ে লাগল শত্রুর মাথায়। কিন্তু শব্দ বের হলো না তার গলা থেকে। ডান পাশে শব্দ। কামাল ঘুসি চালাবার পরপরই ঝাঁপিয়ে পড়ল সেদিকে। একজন দণ্ডায়মান শত্রুকে নিয়ে পড়ল ও মাটিত।

শত্রুর বুকের উপরই পড়েছে কামাল। বিমূঢ় শত্রু কিছু বুঝে ওঠার আগেই কামাল তার গলা চেপে ধরল ডান হাতে। আত্মরক্ষার ব্যাকুল চেষ্টায় কামালের হাত গলা থেকে সরাবার জন্যে শত্রু তার দুই হাত কামালের হাতের উপর রাখল। কোমর থেকে টেনে আনল কামাল বাঁ হাত দিয়ে ধারাল ভারি ছোরাটা।

নরকযাত্রী পশুর তীক্ষ্ণ ভয়ার্ত চিৎকারে কেঁপে উঠল চারিদিক। কামাল ছোরা ঘষছে তখনও শত্রুর গলায়। মুহূর্ত পরই চিরতরে থেমে গেল শত্রুর চিৎকার। হাত পা দুটো তখনও প্রচণ্ড আক্ষেপে দিকবিদিক ছুটে যেতে চাইছে। ছটফট করছে সর্বশরীর।

সাত

এ যুদ্ধ চলতে পারে না এ যুদ্ধে সমাপ্তি চাই। শত্রুকে স্তব্ধ করে দিতে হবে যেমন করেই হোক। তাহলেই থামবে এই যুদ্ধ।

গভীরভাবে ভাবছিল রাসেল। সকাল হতে এখনও তিন ঘণ্টা বাকী। গোলাগুলি যা আছে তাতে তিন ঘণ্টার বেশি টিকে থাকা অসম্ভব। সুতরাং সকালের আগেই শেষ করতে হবে এই যুদ্ধ। এবং সামনের শত্রু পক্ষকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারলেই তা সম্ভব।

শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে।

কিন্তু কিভাবে?

মুষলধারে বৃষ্টির মত বুলেট এসে পড়ছে এপারে। সেই সাথে কামানের গোলা। নদীর ওপার থেকে ট্রেঞ্চে বসে গুলি চালাচ্ছে শত্রুপক্ষ। আর নৈহাটির মুখোমুখি ঘাঁটি থেকে কামানের গোলা ছুঁড়ছে।

প্রচুর শক্তি শত্রুর। সৈন্য সংখ্যাও প্রচুর। একদল বিশ্রাম নিচ্ছে একদল যুদ্ধ করছে। গোলাগুলির সরবরাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হচ্ছে।

সম্মুখ যুদ্ধের ঝুঁকি নেয়াটা চরম ভুল হয়ে গেছে। ভাবল রাসেল। এই ভুল সংশোধন করতে হবে। শত্রুর ঘাঁটিতে হানতে হবে আঘাত।

কৃষ্ণপুর হয়ে নৈহাটিতে যাওয়ার চেষ্টা করা অনুচিত। শহীদ সে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে।

শিকারপুর থেকে পিছিয়ে গিয়ে মুকুন্দপুর গ্রামের কাছে বেতনা নদী পেরিয়ে, নদীর পাড় ধরে সোজা পথে যেতে হবে পুলমারা গ্রামে। নদী ওখানে মোড় নিয়েছে

ধনুকের মত। পাড় ধরে গেলেই দীপাদিহি। তারপর নৈহাটি।

বারোজনকে রেখে আসলামকে সাথে নিয়ে মুষলধারে গোলাগুলি বৃষ্টির মধ্যেই ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে এল রাসেল! দুটো টিনে দুই গ্যালন পেট্রল নিল ওরা সাথে।

কামানের গোলা সশব্দে উড়ে আসছে মাথার উপর দিয়ে। সামনে পড়ছে কখনও। কখনও পিছনে পড়ছে। কেঁপে উঠছে মাটি। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই ওদের। ওরা ছুটে চলেছে।

আধ ঘন্টার মধ্যে নদী পেরিয়ে পুলমারা গ্রামের শেষ মাথায় পৌঁছে নদীর কিনারা ধরে ছুটতে দেখা গেল ওদেরকে।

দীপাদিহি গ্রাম দিয়েই নৈহাটি যাবার নিয়ম। কিন্তু নিয়ম এখানে অচল। নদীর কিনারা ছেড়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নৈহাটির দিকে ছুটল ওরা।

জঙ্গল শেষ হতে ফাঁকা মাঠ। সশব্দে শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলতে ফেলতে দাঁড়াল ওরা। মাঠের পর নৈহাটি হাট।

দূর থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই। আলোর এতটুকু চিহ্ন নেই কোথাও।

দ্রুত পায়ে মাঠের উপর দিয়ে নৈহাটি হাটের দিকে চলল ওরা।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই লম্বা লম্বা শুকনো ঘাসের রাজ্যে ঢুকল আসলামকে নিয়ে রাসেল।

আসলামকে নির্দেশ দিয়ে একাই এগিয়ে গেল রাসেল।

সময় বয়ে চলল। আসলাম কানখাড়া করে হাতের কাজ নিয়ে পড়ল। ঘাসের বন যেখানে শুরু সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে আসলাম।

বড় একটা চটের ছেঁড়া থলেকে পাকিয়ে লম্বা করে বাঁধল আসলাম। লম্বা তার দিয়ে বাঁধল পাকানো থলের একটি মাথা। পাকানো থলেটা জবজবে করে ভিজিয়ে নিল ও পেট্রল ঢেলে।

হাতে আসলামের দিয়াশলাই। কান দুটো খাড়া হয়ে আছে। স্টেনগানটা মাটিতে রেখে বসল ও পাশে।

আরও পাঁচ মিনিট কাটল।

তারপর শোনা গেল বাঁশীর শব্দ। বহুদূর থেকে ভেসে আসছে।

পেট্রল ভেজা পাকানো থলেতে আগুন ধরিয়ে দিল আসলাম। লম্বা তারটার শেষ মাথাটা ধরে ছুটল ও ডান দিকে।

দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল শুকনো ঘাসের বিশাল রাজ্য।

আট

গোটা নৈহাটি হাটটাকেই ঘিরে রেখেছে লম্বা লম্বা ঘাস।

মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে নৈহাটির পিছন দিক থেকে দীপাদিহির পাশ ঘেঁষে

কৃষ্ণপুরের চওড়া মেঠো রাস্তার ধারে পৌঁছে গেল আসলাম।

কৃষ্ণপুর থেকে নৈহাটি হাটের পিছন দিকে পৌঁছুল রাসেল মাত্র সাত মিনিটে। শত্রু-ঘাটির ঠিক মাঝখান বরাবর কুয়াশার দেয়া আগুনে বোমা দুটোও ছুঁড়ে মেরেছে সে। নৈহাটি হাটের চতুর্দিকে দাবাগ্নি। শত্রুপক্ষের মাথায় বিনা মেঘে বজ্রপাত পড়েছে।

হিসেব রাসেল নিখুঁতই করেছিল। শত্রুর দুটো মাত্র পথ পালাবার। কৃষ্ণপুর হয়ে নদীর ধারে যুদ্ধরত সঙ্গীদের সাথে খোলা আকাশের নিচে গিয়ে আশ্রয় নেয়া। নয়ত নৈহাটির পিছন দিক দিয়ে আগুনের লেলিহান শিখাকে পাশ কাটিয়ে পালিয়ে যাওয়া।

কিন্তু পালিয়ে যাবার কোন সুযোগ ওদেরকে রাসেল দিচ্ছে না? কৃষ্ণপুরের রাস্তায় এবং নৈহাটির পিছনে, আগুনের পাশাপাশি অপেক্ষা করছে যথাক্রমে আসলাম এবং রাসেল।

শত্রু দিশেহারা হয়ে পড়বে জানত রাসেল। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠবে তা ও অনুমান করেনি।

দুই পাশে আগুন। মাঝখানে মেঠো রাস্তা। রাস্তার উপরই শুয়ে আছে রাসেল।

আশায় আশায় ভরে উঠেছে মন। জয় অবশ্যম্ভাবী। দলে দলে পাঞ্জাবী সেনারা বেসামাল অবস্থায় ছুটে আসছে।

ট্রিগারে আঙ্গুল রেখে কয়েক মুহূর্তের অপেক্ষা শুধু এখন। নাইট বায়নোকুলারে অবিশ্বাস্য সব দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। জীবনের এক পরম অভিজ্ঞতা।

বিশ্বের তথাকথিত সেরা যোদ্ধাদের এই করুণ অবস্থা দেখে প্রচণ্ড হাসি পেল রাসেলের।

ছুটে আসছে ভেড়ার পালের মত বীর যোদ্ধারা। বীর যোদ্ধাই বটে। শত্রুর কোন চিহ্ন ওরা দেখতে পাচ্ছে না। দেখতে না পেলে কি হবে কাঁদ কাঁদ মুখ করে দুই হাত মাথার উপর তুলে হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে আসছে তারা। কেউ কেউ হোঁচট খেয়ে ধরাশায়ী হচ্ছে। কেউ তুলছে না তাকে। নিচের দিকে ওদের দৃষ্টি নেই। চারিদিকের আগুন দেখছে ওরা। আর জীবন ভিক্ষা চাইবার জন্যে সেই আগুনের ভিতর খুঁজছে মুক্তি সেনাদেরকে। আছড়ে পড়া সাথীর পিঠে পা দিয়ে এগিয়ে আসছে দলে দলে।

অথচ এরাই আমার মাকে, আমার বোনকে বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করেছে। দুই চোখ জলে ভরে উঠল রাসেলের। অথচ এরাই লক্ষ লক্ষ নিরীহ বাঙালী সন্তানকে খুন করেছে। ধর্ষণ করেছে মা-বোনদেরকে পৈশাচিক উল্লাসে। পশু নয়, ওরা পশুরও অধম। মা, তুমি দেখো, কেমন প্রতিশোধ নেয় তোমার ছেলে।

দাঁতে দাঁত চেপে এল. এম. জি-র ট্রিগার চেপে ধরে গুলিবর্ষণ করতে শুরু করল রাসেল। পরমুহূর্তে হাঃ হাঃ করে হিংস্র প্রতিহিংসায় হেসে উঠল রাসেল। দেখতে

দেখতে বিশ পঁচিশ গজ সামনে লাশের পাহাড় তৈরি হলো।

ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো কৃষ্ণপুরের রাস্তায় আসলামের চোখের সামনে।

ছোট দুই ভাই মুক্তি যুদ্ধে শহীদ হয়েছে ওর। প্রতিশোধ নিল আজ আসলাম প্রাণভরে।

নদীর পাড়ে যুদ্ধরত শত্রুরা আতঙ্কে ভুলে গেল গুলি ছোঁড়ার কথা। পিছনে আগুন। বুঝতে বাকী রইল না ঘাঁটি ধ্বংস করে দিয়েছে মুক্তি সেনারা।

নৈহাটি হাট তখন পুড়ছে আগুনে। অ্যামুনিশনের গুদামে আগুন ধরে গেছে। অবিরাম প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ধাক্কায় থেকে থেকে কাঁপছে মাটি।

এদিকে পিছন দিক থেকে দ্রুত এগিয়ে আসছে বিস্তৃত অগ্নিশিখা। দিশেহারা শত্রুরা ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে। এবং সলিল সমাধি লাভ করতে বিলম্ব ঘটল না।

নয়

শত্রুর শেষ রাখতে চায়নি শহীদ।

কামাল বলল, 'দেরি করাটা মোটেই উচিত না। লীনাদের বিপদটা কি ভয়ঙ্কর রকম বুঝতে পারছিস না তুই?'

অগত্যা আহত এবং পলাতক শত্রুদেরকে খোঁজাখুঁজি বাদ দিয়ে রাহিলীপোতা গ্রাম ত্যাগ করে ওরা বিশালজলাভূমির উপর দিয়ে ছুটল ন্যাটাডিঙির দিকে। ভুল করল ওরা। জীবিত শত্রুরা পিছু নিল ওদের।

ন্যাটাডিঙিতে পৌঁছুবার আগেই কেঁপে উঠল মাটি। কেঁপে উঠল শুধু নয়, কাঁপতেই লাগল। পিছন দিকে তাকিয়ে হতবাক হয়ে গেল ওরা। উত্তরের আকাশ লাল।

আগুন লেগেছে। সেই সাথে বিস্ফোরণের শব্দ এবং কম্পন। বুঝতে কিছু বাকী রইল না ওদের।

রাসেলের কীর্তি। সন্দেহ নেই।

'অদ্ভুত ছেলে।'

শহীদের গলায় প্রশংসার সুর।

'কালে বিরাট এক লোক হবে ও। যেমন প্রাণবন্ত, তেমনি বুদ্ধিমান।'

বলল কামাল।

ন্যাটাডিঙিতে পৌঁছে মন ভেঙে গেল ওদের। গ্রামটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। হাসপাতালের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া গেল না। গ্রামটা চষে ফেলল ওরা। একজন মানুষকেও জীবিত পাওয়া গেল না। লাশ যে ক'টা পাওয়া গেল তার মধ্যে পরিচিত কেউ নেই।

পুকুরটার ধারে এসে দাঁড়াল ওরা। হঠাৎ কানে এসে ঢুকল কাতর একটা ধ্বনি।

'মাগো।'

বাঁ পাশ থেকে এসেছে শব্দটা। এগিয়ে গেল ওরা। মেয়েলি গলা।

প্রৌঢ়া এক মেয়েছেলে আহত হয়েছে। পরীক্ষা করে শহীদ বুঝল মৃত্যু অবধারিত। বুকে গুলি লেগেছে।

কামাল পুকুর থেকে পানি এনে প্রৌঢ়ার মুখে দিল। শহীদ তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'হাসপাতালের লোকগুলো কোন্ দিকে গেছে বলতে পারেন?'

'ওগো ধইরা…নি…নিছে…। ধুপপাড়া…।'

মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল প্রৌঢ়া।

'ধুপপাড়ায় যাব।'

বলল কামাল।

শহীদ বলল, 'গিয়ে দেখা যেতে পারে। তবে আশা করা বৃথা। মহিলা কি বলতে চাইছিলেন কে জানে।'

চওড়া মেটো রাস্তা সোজা চলে গেছে ধুপপাড়া অবধি। রাস্তার বাঁ দিকে জলাভূমি। ডানে জঙ্গল।

জঙ্গল কেটে ধুপপাড়া গ্রামের সূচনা হয়েছিল। জঙ্গলের ভিতর গ্রামটা খুব একটা বেড়ে ওঠেনি। দশ বারোজন কৃষকের বাড়ি। বাড়ি বলতে একটা করে একচালার ঘর এবং ছোট একটা উঠান। বাকী সব জঙ্গলই এখনও।

নদীর ধারে অবশ্য আরও কয়েকটি বাড়ি আছে। আছে মসজিদ। কিন্তু ওদিকটায় জঙ্গল নেই। চওড়া রাস্তা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দশ বারোটা একচালাকে পাশে রেখে মসজিদ এবং নদীর কাছ অবধি গিয়ে শেষ হয়েছে।

রাস্তা ধরে হেঁটেই ধুপপাড়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেল শহীদ ও কামাল।

জঙ্গল দু'ধারেই এদিকে। চওড়া রাস্তাটা ধরে আরও শ'খানেক গজ সামনে গেলেই দেখতে পাবার কথা বাড়িগুলো।

রাস্তা ধরে হাঁটলেও জঙ্গল ঘেঁষে হাঁটছিল ও। নিঃশব্দ পায়ে আরও পঞ্চাশ-ষাটগজ এগোবার পর আলো দেখা গেল।

হারিকেনের আলো। একটি ঘরের খোলা দরজা দেখা যাচ্ছে। দরজা পথে দেখা যাচ্ছে কয়েকজন পাঞ্জাবী সেনা নড়াচড়া করছে।

নিশ্চিন্তে আছে শত্রু। বিপদের সম্ভাবনা নেই বলে মনে করেছে হয়ত।

দ্রুত ভাবতে লাগল শহীদ কিভাবে আক্রমণ করা যেতে পারে। কামাল নিচু গলায় বলে উঠল, 'দুজন দুদিক থেকে আক্রমণ করলে ভাল হয়।

শহীদ উত্তর দেবার আগেই মাত্র বিশ গজ সামনের একটি বট গাছের মোটা

কাণ্ডের আড়াল থেকে গর্জে উঠল মেশিনগান।

দমকা একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল কামালের বুক থেকে। পড়ে গেল ও তাল সামলাতে না পেরে।

পালটা গুলি না করে কামালকে তুলে নিয়ে জঙ্গলের আড়ালে চলে গেল শহীদ।

'কোথায় লেগেছে?'

উঠে বসল কামাল। নিজের স্টেন গানটা ধরল দুই হাতে। ব্যথায় চোখমুখ কুঁচকে কুঁচকে উঠছে ওর।

'পায়ে লেগেছে। মাংস ভেদ করে বেরিয়ে গেছে বুলেট। তেমন কিছু না, চিন্তা করিসনে। শত্রুরা পাহারায় আছে। ডান দিক থেকে আক্রমণ করবি তুই?'

শহীদ ঝোলা থেকে তুলো ইত্যাদি বের করে ব্যান্ডেজ বাঁধতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে।

কামালের হাঁটুর উপরে বুলেট লেগে বেরিয়ে গেছে।

শত্রু গুলি করেছিল সন্দেহের উপর। পাল্টা গুলির শব্দ হলো না দেখে সন্দেহটা দূর হলো। কিন্তু মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। দুজন ছিল ওরা বটগাছের আড়ালে। একজন টর্চ হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল আড়াল থেকে।

জঙ্গল থেকে মাথা বের করে শহীদ এবং কামাল দেখছিল সব। টর্চের আলোয় রাস্তা দেখতে দেখতে এগিয়ে আসছে শত্রু।

'তুই সামলা।'

নিচু গলায় বলল শহীদ, 'ইটের জবাব পাথর দিয়েছে।'

হেসে ফেলল কামাল। হাসতে হাসতে স্টেনগানটা একটু উঁচু করে ট্রিগার টিপল ও?

টুঁ-শব্দ করার অবকাশও পেল না শত্রু। ধরাশায়ী হলো। এক ঝাঁক বুলেট বুকে নিয়ে।

বটগাছের আড়াল থেকে শুরু হলো মেশিনগানের বুলেট বৃষ্টি। কিন্তু সে মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে। শহীদ ততক্ষণ একটা গ্রেনেডের পিন আলগা করে ছুঁড়ে মেরেছে বটগাছের দিকে।

অব্যর্থ লক্ষ্য শহীদের।

গ্রেনেডটা বিস্ফোরিত হলো বটগাছের এক হাত পেছনে, পাশ ঘেঁষে।

তীক্ষ্ন আর্তনাদ শোনা গেল শত্রুর। মেনিশনগান স্তব্ধ হয়ে গেছে কয়েক সেকেণ্ড আগেই।

কিন্তু এবার শুরু হলো আসল বিপদের সূচনা। সামনের দিক থেকে গর্জে উঠল কমপক্ষে আট দশটা মেশিনগান এক সাথে।

সেই সাথে উড়ে এল একটা গ্রেনেড।

মাথার উপর দিয়ে চলে গেল গ্রেনেডটা। প্রায় পনেরো হাত পেছনে গিয়ে বিস্ফোরিত হলো সেটা।

শহীদের নির্দেশে জঙ্গলের ভিতর মাথা ঢুকিয়ে নিল কামাল।

তারপর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলল ওরা দু'জন সামনের দিকে হামাগুড়ি দিতে দিতে।

বিশ গজের মত যাবার পরই থামতে বাধ্য হলো ওরা।

জঙ্গল আপাতত এখানেই শেষ। সামনে দু'একটা গাছ। ফাঁকা জায়গা খানিকটা। পঁচিশ গজ সামনে প্রথম বাড়িটা। পাশে আরও দুটো ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর।

ঘরগুলোর সামনে ট্রেঞ্চ। ফাঁকা জায়গাটাতেও ট্রেঞ্চ দেখা যাচ্ছে। প্রতিটি ট্রেঞ্চে দু'জন তিনজন করে শত্রু।

শহীদ ফিসফিস করে বলল, 'গুলি চালাসনে। শত্রু সম্ভবত ঘিরে ফেলেছে আমাদেরকে।'

বুঝতে পারল না কামাল শহীদের কথা।

বেশ কিছু বুলেট সহজে খরচ হয়ে গেল। লাশ তিনটে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু খান-সেনাদের তৎপরতা বোঝা যাচ্ছে না কিছুই।

ট্রেঞ্চ থেকে দশ মিনিট পরই বেরিয়ে পড়ল দুজন মুক্তিসেনা।

কামরা থেকে মহুয়া চিৎকার করে বলল, 'কোথায় যাচ্ছ তোমরা?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সবুর এবং জামাল। হাত দিয়ে গেটটা দেখাল তারা।

মহুয়া হাত নেড়ে নিষেধ করল।

কিন্তু শুনল না ওরা। হামাগুড়ি দিতে দিতে গেটের দিকে এগিয়ে চলল তারা দুজন।

সবচেয়ে বেশি কষ্ট হচ্ছে জামালের। বেচারার হাঁটুর পিছনের ঘা এখনও শুকায়নি। নতুন ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছে সকালে মহুয়া। রক্ত বেরিয়ে লাল হয়ে গেছে ব্যাণ্ডেজটা। পায়ের নিচের অংশটা ক্রমশ অসাড় হয়ে আসছে অপারেশনের পর। তিনটে বুলেট বেরিয়েছিল ওর হাঁটুর পিছন থেকে।

সবুরের ডান পা'টা একেবারেই নেই। ব্যাণ্ডেজ আছে, কিন্তু ঘা ওর প্রায় শুকিয়ে এসেছে।

কিন্তু জামালকে ছেড়ে আগে এগিয়ে যাচ্ছে না সবুর। জামালের কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছে সে। মাঝে মধ্যে জামালকে ধরে সাহায্য করছে।

গেটের প্রায় কাছাকাছি চলে গেছে ওরা। এমন সময় প্রচণ্ড শব্দ হলো।

কেঁপে উঠল যেন গোটা দুনিয়া। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল মহুয়া।

যেমন আচমকা ছিটকে পড়ল তেমনি আচমকা উঠে দাঁড়াল মহুয়া। পড়ে গেলেও

কোথাও আঘাত পায়নি সে।

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে মহুয়া দেখল হাসপাতালের দেয়ালটা ভেঙে গেছে মর্টারের গোলায়।

গেটের মাঝখানে পৌঁছে গেছে সবুর এবং জামাল।

কামরার ভিতর থেকে গর্জে উঠল খবিরের স্টেনগান।

ভাঙা পাঁচিলের ওপরে একজন খান-সেনাকে দেখে গুলি করেছে সে। কিন্তু অনেকটা দূরে তারা। কাজ হলো না।

গর্জে উঠল সবুর এবং জামালের স্টেন।

শত্রুর আর্তচিৎকার কানে এল।

পর মুহূর্তে শুরু হলো নারকীয় কাণ্ড।

গর্জে উঠল একযোগে কয়েক ডজন এল. এম. জি এবং দুটো মর্টার। গোটা বাড়িটা থরথর করে কাঁপছে। ইঁট-বালি খসে পড়ছে।

উপর পানে তাকিয়ে আকাশ দেখতে পেল মহুয়া।

জানালা দিয়ে তাকাবার দরকার ছিল না। সবুর এবং জামালের কি হয়েছে তা জানবার বাকী নেই।

লাশ দুটো দেখে মোচড় দিয়ে উঠল বুকটা।

খবিরের উদ্দেশ্যে তাকাতেই মহুয়া আঁতকে উঠল। নেই খবির।

কিন্তু পর মুহূর্তে শান্ত হয়ে গেল মহুয়া। বাধা দিয়ে কি হবে আর। যাক, যা ইচ্ছা করুক। মরার আগে চেষ্টার ত্রুটি যেন না থাকে।

লীনার পদশব্দ শুনে পিছন ফিরে তাকিয়ে শুকনোভাবে হাসল মহুয়া।

'এল না দাদারা কেউ!'

হাহাকার করে উঠল লীনা।

মহুয়া বলল, 'পিছনেও রয়েছে একজন, না?'

'হ্যাঁ। ওরা লুকিয়ে বসে আছে। গুলি টুলি করছে না। কেন বুঝতে পারছি না।'

'মিসেস রহমান কি খুব ভয় পেয়েছেন?'

'মোটেই না। তিনি তো রীতিমত সাহস দিচ্ছিলেন আমাকে।'

'না তুই।'

মহুয়া বলল, 'এখানে বিপদ বরং বেশি।'

লীনা বলল, 'তোমাকে নিতে এসেছি। ছাদ চাপা পড়ে মরে যাবে যে।'

হেসে ফেলল মহুয়া, 'মরতে তো হবেই। ছাদ চাপা পড়ে মরাটা মন্দ কিসে?'

লীনা মহুয়ার একটি হাত ধরে বলল, 'দূর! চলো ভাবী...!'

মহুয়ার কথা শেষ হলো না। গর্জে উঠল অদূরেই কয়েকটা স্টেনগান।

পরমুহূর্তে শোনা গেল খবিরের অন্তিম চিৎকারঃ মা-গো-ও-ও-ও...!

জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে না।

সব শেষ হয়ে গেছে। গেট পেরিয়ে দলে দলে ঢুকছে খান্-সেনারা স্টেনগান উঁচিয়ে।

'এখানেই দাঁড়া।'

বলল মহুয়া লীনাকে। নিজের গায়ের সাথে চেপে ধরে, 'ফেলে দে স্টেনগান।'

বাইরে থেকে কর্কশ কণ্ঠে আদেশ হলোঃ আন্দর যো ভি হো বাহার আ যাও!

ধীর পায়ে লীনাকে জড়িয়ে ধরে বারান্দায় বেরিয়ে এল মহুয়া।

লীনা অসহায় পক্ষীশাবকের মত কাঁপছে মহুয়ার বুকে মুখ লুকিয়ে।

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল একসঙ্গে কয়েকজন পশু-সেনা।

নিষ্পলক, ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে খান-সেনাদের দিকে তাকিয়ে রইল মহুয়া। কথা বলল না। কোন অনুরোধ করল না। এমনকি কাঁদলও না মহুয়া।

একজন অফিসার গোছের খান-সেনা উঠে এল বারান্দায়।

মুহুয়া পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল্, 'তোমরা মারতে চাও মারো। কিন্তু আমাদের গায়ে হাত দিয়ো না।'

বেঁধে ফেলার হুকুম করল পাঞ্জাবী সেনা মহুয়া এবং লীনাকে।

দশ

'কি বলছিস, শহীদ?'

কামাল প্রশ্ন করল।

উত্তর দিতে হলো না শহীদকে। পিছন থেকে গর্জে উঠল স্টেনগান্।

'একি!'

চমকে উঠল কামাল।

শহীদ ফিসফিস করে বলল, 'আমি আগেই টের পেয়েছি। শত্রু আমাদের পিছু নিয়ে এসেছে রাহিলীপোতা থেকে।'

গর্জে উঠল স্টেনগান ডান দিক থেকে। এক মুহূর্ত পর বাঁ দিক থেকেও শোনা গেল ব্রাশ ফায়ারের শব্দ।

'মৃত্যু অবধারিত।'

কথাটা বলে শহীদ একটি গ্রেনেড ছুঁড়ে দিল সামনের দিকে। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছে কামাল। শহীদের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে সে।

'শহীদ!'

'বলবি কিছু?'

শহীদ আরও একটা গ্রেনেড ছুঁড়ে মারল। এবার পিছন দিকে।

'একি ব্যাপার! ওরা ঘিরে ফেলেছে আমাদেরকে।'

অতি কষ্টে হাসল শহীদ।

বলল, 'বুঝতেই তো পারছিস।'

বোবা বনে গেল কামাল।

সামনের ফাঁকা জাগাটায় পাশাপাশি তিনটে ট্রেঞ্চ। ট্রেঞ্চের ভিতরকার শত্রুদের সাড়াশব্দ নেই। কিন্তু স্টেনের নলগুলো বেরিয়ে আছে দেখা যাচ্ছে। গুলি ছুটে আসছে কুঁড়েঘরগুলোর সামনের ট্রেঞ্চ থেকে।

অনুমানের উপর নির্ভর করে গুলি ছুঁড়ছে শত্রুরা। এখনও দেখতে পায়নি ওরা ওদের দুজনকে।

গ্রেনেড বেশি নেই। মাত্র তিনটে আর। গুলিও নেই যথেষ্ট।

স্টেন তুলে নিল কামাল।

এগিয়ে গেল ক্রলিং করে আধহাত। শহীদ একটা হাত রাখল কামালের পিঠে আলতো করে।

চমকে উঠে তাকাল কামাল।

চাপা কণ্ঠে বলল ও, 'কি রে?'

'কাছাকাছি থাকিস।'

'কেন রে?'

কেমন যেন আঁতকে উঠল কামাল।

শহীদ হাসবার চেষ্টা করছে। কামাল ভীষণ ঘাবড়ে গেছে। মরিয়া হয়ে উঠছে বাঁচার চেষ্টা করার জন্যে, বুঝতে পারছে শহীদ।

'মনে নেই, শয়তান? মরার সময় একসাথে, হাত ধরাধরি করে মরব বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমরা?'

একটু যেন কেঁপে গেল শহীদের কণ্ঠস্বর। গফুরের মৃতদেহটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। গফুরের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে থাকার সময়ও ছিল না তখন। সেটা ছিল পঁচিশে মার্চের রাত। এটা অক্টোবর।

পিছিয়ে এল আবার আধহাত কামাল।

বলল, 'সত্যিই কি আমরা মরতে যাচ্ছি, শহীদ!'

'হ্যাঁ।'

ছোট্ট উত্তর শহীদের।

দুজনেই চুপচাপ।

শত্রুপক্ষ চারিদিক থেকে অবিরাম গুলি চালাচ্ছে। থেকে থেকে কেঁপে উঠছে মাটি। গ্রেনেডের প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হচ্ছে। আলোকিত হয়ে উঠছে মুহূর্তের জন্যে দিকবিদিক।

ওদের কারও মুখে কোন কথা নেই।

'কেমন লাগছে রে?'

অনেকক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল শহীদ।

কথা বলল না সাথে সাথে কামাল। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'মনে পড়ছে…।'

শুরু করেও বলতে পারল না কামাল।

শহীদের একটা হাত কামালের মাথায় গিয়ে পড়ল আস্তে আস্তে। কামালের মাথার চুল মুঠো করে ধরে একটু চাপ দিল শহীদ।

'মনে পড়ছে ছোটবেলার কথা।'

ধীরে ধীরে, দম নিয়ে নিয়ে, উদাস ভাবে বলছে কামাল, 'একবার দুটো ছেলে ঘুসি মেরে আমার নাক ফাটিয়ে দিয়েছিল। আমি পারছিলাম না ওদের সাথে। কোত্থেকে যে তুই ছুটে এলি। মার খেয়ে পালিয়ে গেল ওরা। সেদিন বড় বাঁচা বেঁচে গিয়েছিলাম রে…।'

শহীদ কামালের মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে বলল, 'কিন্তু আজ আমি তোকে বাঁচাতে পারব না রে, কামাল।'

'মনে পড়ছে…মনে পড়ছে…।'

অনেক কথা মনে পড়ছে। কোনটা ছেড়ে কোনটা বলবে ভেবে পাচ্ছে না কামাল। ছোট বেলা থেকে একসাথে বড় হয়েছে ওরা। একসাথে খেয়েছে, এক বিছানায় শুয়েছে, একসঙ্গে খেলেছে, বকুনি খেয়েছে, স্কুলে গেছে, দুষ্টুমি করেছে। কত মধুর স্মৃতি, কত রোমাঞ্চকর অনুভূতি, কত বিচিত্র ঘটনা—সব একসাথে দেখা, একসাথে উপভোগ করা।

'সিগারেট খাবি, কামাল?'

'খাবি?'

শহীদ বলল, 'তুই খা। এইতো শেষ। সিগারেটের যে পাগল তুই।'

আর কিসের ভয়? আর কেন সাবধানতা? পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল কামাল।

গ্রেনেড বিস্ফোরিত হবার সাথে সাথে অত্যুজ্জ্বল আলো দেখা যাচ্ছে। শহীদের মুখ দেখছে সেই আলোয় কামাল। কামালের মুখ দেখছে শহীদ।

'শেষ কি ইচ্ছা হচ্ছে বল তো তোর, শহীদ?'

জিজ্ঞেস করল কামাল।

কামালও ভাবছিল। গফুরের কথা মনে পড়ছিল। কত বকুনি দিয়েছে সে। চুপ করে শুনত। বড় ভালবাসত গফুর সবাইকে। অথচ তার মৃত্যুতে মন খারাপ করার অবসরও ছিল না তখন।

এগারো

প্রতিদিন, প্রতিঘণ্টা, প্রতি মিনিট মহুয়া আশা করছে শহীদ আসবে। কিন্তু বৃথা আশা। ওদের দেখা নেই।

ক্যাপ্টেন আকরাম খান ঝড়ের বেগে ঢুকল ঘরের ভিতর। রাগে, উত্তেজনায় চোখমুখ ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসছে যেন তার।

পিছু পিছু ঢুকল দুই খান-সেনা।
ভয়ে ভয়ে চোখ তুলে তাকাল মহুয়া।
দাঁতে দাঁত চাপল আকরম খান। লীনার দিকে তাকাল সে দুই হাত কোমরে দিয়ে।
ভয়ে চোখ ফেরাল লীনা। মহুয়ার দিকে তাকাল সে।
'ইমান খান!'
চিৎকার করে উঠল ক্যাপ্টেন আকরম খান।
'ইয়েস, স্যার!'
হুকুম দিল আকরম খান, 'বেয়োনেট লাও!'
বেয়োনেট ফিটকরা রাইফেলটা এগিয়ে দিল ইমান খান।
লীনার দিকে এক পা এগিয়ে গেল বেয়োনেট লাগানো রাইফেল নিয়ে আকরম খান।
'না—আঃ আঃ!'
চিৎকার করে উঠল লীনা।
দাঁত বের করে নিঃশব্দে হেসে উঠল দুই পশু-সেনা।
আকরম খান হুকুম করল, 'ইস যোয়ান লেড়কীকা কাপড়া উতারো, ইমান খান!'
এগিয়ে গেল ইমান খান এবং তার সাথী।
মেঝেতে পড়ে আছে মহুয়া। হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা ওর। পা দুটোও বাঁধা।
তবু এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল মহুয়া। মহুয়া চিৎকার করে উঠল।
দুই চোখে পানি ভরে উঠল মহুয়ার। লীনার দিকে তাকাল না ও ভয়ে ভয়ে। যা ঘটছে তা চোখে দেখার নয়।
আকরম খানের পায়ের সামনে গিয়ে থামল মহুয়া।
'ও, কি দোষ করেছে, ক্যাপ্টেন সাহেব? আমার স্বামী মুক্তিযুদ্ধে গেছে, আমাকে মেরে ফেলুন…।'
প্রচণ্ড এক লাথি মারল আকরম খান মহুয়ার পেট বরাবর।
লাথি খেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে দূরে সরে গেল মহুয়া।
এতটুকু শব্দ বের হলো না তার গলা থেকে।
লীনা অবিরাম আর্তনাদ করছে।
'তোমলোগ বাহার যাও!'
আকরম খান খান-সেনা দুটোকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে কাপড় খুলতে শুরু করল।
সব বুঝতে পারছে মহুয়া। পাঁজরে প্রচণ্ড ব্যথা। ডান দিকের একটি পাঁজর ভেঙে গেছে লাথির আঘাতে। কিন্তু সে ব্যথা কষ্ট দিচ্ছে না মহুয়াকে। দুই চোখ দিয়ে নেমে

আসছে নোনা জল।

এরচেয়ে মৃত্যু শতগুণ, সহস্রগুণ ভাল ছিল। সে বেঁচে রয়েছে। বেচে থেকে দেখতে হচ্ছে লীনার এত বড় সর্বনাশ! কোথায় তোমরা, শহীদ! কোথায় তোমরা!

অকস্মাৎ আকরম খানের অট্টহাসি শোনা গেল। পরমুহূর্তে একটা ঝাপ্টাঝাপ্টির, ধস্তাধস্তির শব্দ।

জ্ঞান হারাল তারপর লীনা।

অচেতন দেহের উপর চলল জঘন্য অত্যাচার।

আকরম খান উঠে দাঁড়াল লীনাকে ছেড়ে দিয়ে।

শব্দ শুনে নড়ে উঠল মহুয়া। খানিক পর ঘাড় ফিরিয়ে ধীরে ধীরে তাকাল সে।

আকরম খান উলঙ্গ। কুৎসিত, কদাকার দেখাচ্ছে তাকে।

লীনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আকরম খান। তার হাতে শক্ত করে ধরা বেয়োনেট লাগানো রাইফেলটা।

ভয়ে, আতঙ্কে অসহায় ভাবে চিৎকার করে উঠল মহুয়া, 'না! না! না!'

আকরম খান বেয়োনেট ঢুকিয়ে দিল লীনার তলপেটে। তখুনি সে বের করল না সেটা।

তীক্ষ্ণধার বেয়োনেটটা ঠেলে দিল আকরম খান।

ক্যাচ ক্যাচ করে আওয়াজ হলো। লীনার তলপেট থেকে বুকের কাছ অবধি চিরে দিল এক টানে।

রাইফেলটা ফেলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল কুকুরটা। দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল সে। তারপর এগিয়ে এল মহুয়ার দিকে।

চিৎকার করে উঠল মহুয়া।

বারো

'ইচ্ছে করছে লীনাকে, মহুয়াদিকে একবার দেখি...!'

কামালের পিঠে হাতটা ছিল শহীদের। মহুয়ার তীক্ষ্ণ চিৎকার কানে ঢুকল হঠাৎ। তারপরই সব চুপচাপ।

হঠাৎ কামাল অনুভব করল শহীদের হাতটা খামচে ধরেছে তার পিঠ।

খানিক পর আলগা করল শহীদ হাতের মুঠো।

'সব শেষ।'

বলল শহীদ।

কামালের সর্বশরীর জ্বলছে। অস্থির হয়ে উঠেছে সে।

'আমার আগেই চলে গেল মহুয়া।'

অস্ফুটে বলল শহীদ।

'ছাড়ব না, প্রতিশোধ নেব।'

ক্রল করে এগিয়ে চলল কামাল।

'কাছাকাছি থাকিস!'

বলল শহীদ।

গুলি এসে লাগল হঠাৎ শহীদের ডানপায়ে। কামাল এগিয়ে যাচ্ছে। শহীদের বুকটা আচমকা কেঁপে উঠল।

কোনদিকে ভ্রূক্ষেপে নেই কামালের।

দ্রুত এগিয়ে চলেছে কামাল সামনের ট্রেঞ্চের দিকে। আর মাত্র দশ পনেরো হাত দূরেই ট্রেঞ্চ।

শহীদ গ্রেনেড ছুঁড়ে মারল একটা। শত্রুকে ব্যস্ত রাখা দরকার। যেন ওদেরকে দেখতে না পায় শত্রু।

দ্বিতীয় গ্রেনেডটা ছুঁড়ল শহীদ ফাঁকা জায়গাটায় হামাগুড়ি দিয়ে এসে।

কামাল পৌঁছে গেছে প্রায়।

শহীদ দেখল কুঁড়েঘরের সামনে পাঁচ ছ'জন পাঞ্জাবী সেনা। ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে ক্রল করে এগিয়ে আসছে তারা।

বায়নোকুলার থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল শহীদ।

কামাল ট্রেঞ্চের কাছে পৌঁছে গেছে। থামল শহীদ। ছুঁড়ে মারল একটি গ্রেনেড।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ হলো।

গর্জে উঠল কয়েকটা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। একটা বুলেট লাগল শহীদের বাঁ হাতের কব্জিতে।

এগিয়ে যাচ্ছে শহীদ। কামাল ট্রেঞ্চে নামছে। ট্রেঞ্চ থেকে মাত্র পাঁচ হাত দূরে এখন শহীদ। এমন সময় শহীদ এবং কামালের জীবনের সবচেয়ে মর্মন্তুদ ঘটনাটা ঘটল।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল শহীদের যেন নাকের ডগায়।

পৃথিবীটা যেন নড়ে উঠল প্রবলভাবে। দুলছে যেন গোটা জাহান। অন্ধকার নেমে আসছে। শহীদ কামালের নাম ধরে ডাকার প্রাণপণ চেষ্টা করল। এগিয়ে যাচ্ছে ও। একবার মনে হচ্ছে মরে গেছে। একবার মনে হচ্ছে—না বেঁচে আছে।

নেমে এল গাঢ় অন্ধকার। অন্ধকার নেমে আবার পূর্ব মুহূর্তে শহীদের মনে হলো—মারা যাচ্ছে ও। একটা হাত বাড়িয়ে দিল ও।

উত্তপ্ত একদলা মাংসের উপর গিয়ে থপ্ করে পড়ল হাতটা। কামালের দলা পাকানো দেহটার উপর পড়েছে শহীদের হাত।

তেরো

একনাগাড়ে মেশিনগানের গুলি এবং গ্রেনেডের শব্দ শোনা গেল প্রায় পনেরো মিনিট।

শত্রুপক্ষ পাল্টা জবাব না পেয়ে অবশেষে থামল। নিস্তব্ধতা নেমে এল

ধুপপাড়ায়।

কেটে গেল আরও কয়েকটি মিনিট। ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে এল কয়েকজন পাঞ্জাবী সেনা। উঠে দাঁড়াল এক একজন করে। শহীদের এবং কামালের অবস্থানের দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ করল তারা। টর্চের আলোয় দূর থেকে অনেকক্ষণ ধরে দেখল।

শহীদ এবং কামাল নড়ছে না এতটুকু। পাঁচজন খান-সেনা এগিয়ে আসতে শুরু করল স্টেনগান উঁচিয়ে।

এগিয়ে আসছে পাঁচজন। পাঁচজনেরই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কামাল এবং শহীদের দিকে।

ট্রেঞ্চের সামনে এসে দাঁড়াল পাঁচজন। কামালের অর্ধাংশ পড়ে আছে ট্রেঞ্চের ভিতর। বাকী অর্ধাংশ ট্রেঞ্চের উপর থাকার কথা। কিন্তু তা নেই।

গ্রেনেড পড়েছিল কামালের শরীরের উপরের অংশেই। সেটুকু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

শহীদের দিকে এগিয়ে এল পাঁচজন খান-সেনা এবার।

উপুড় হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে শহীদ।

একজন খান-সেনা বুট জুতো দিয়ে শহীদের দেহটা উল্টে দেখার চেষ্টা করছে।

গর্জে উঠল একটি এল. এম.জি.।

চোখের পলকে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট এসে আশ্রয় নিল পাঁচজন খান-সেনার দেহের সর্বত্র। কাটা কলা গাছের মত আছড়ে পড়ল পাঁচজনই।

ক্রল করে বেরিয়ে এল ফাঁকা জায়গাটায় জঙ্গলের ভিতর থেকে এল. এম. জি. হাতে কুয়াশা।

কুঁড়েঘরের সামনের ট্রেঞ্চ থেকে শত্রুপক্ষ মেশিনগান চালাতে শুরু করল।

ফাঁকা জায়গাটায় থেমেছে কুয়াশা। গ্রেনেড ছুঁড়ে মারল ও একটা। কুঁড়েঘরের গায়ে গিয়ে লাগল সেটা। আগুন ধরে গেল বেড়ার দেয়ালে।

দ্রুত ভাবছিল কুয়াশা। কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে। পিছিয়ে এল আবার কুয়াশা। আবার একটি গ্রেনেড ছুঁড়ে মারল ও।

ট্রেঞ্চের অনেকটা সামনে সেটা বিস্ফোরিত হলো।

শত্রুপক্ষের ক্ষতি হলো কিনা দেখার জন্যে অপেক্ষা করল না কুয়াশা।

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দ্রুত ছুটল ও। অনেকটা দূরত্ব অতিক্রম করে কুয়াশা জঙ্গল থেকে মাথা বের করে দেখল কুঁড়েঘরগুলোর বাঁ দিকে চলে এসেছে সে।

সেখানে দাঁড়িয়ে আবার একটি গ্রেনেড ছুঁড়ল কুয়াশা। তারপর এল. এম. জি.র ট্রিগার টিপে ধরল। আধ মিনিট গুলিবর্ষণ করেই কুয়াশা প্রকাণ্ড কয়েকটি লাফ দিয়ে আবার খানিকটা দূরত্ব অতিক্রম করল।

ধুপপাড়ার প্রথম পর্যায়ের বাড়িগুলোর পিছনে গিয়েও কুয়াশা গ্রেনেড ছুঁড়ল একটা এবং আধ মিনিট গুলিবর্ষণ করল।

একই পদ্ধতিতে গোটা শত্রু ঘাঁটি ঘিরে গ্রেনেড নিক্ষেপ এবং গুলিবর্ষণ করে শত্রুপক্ষের মনোবল একেবারে ভেঙে দিল কুয়াশা। সে যে একা তা শত্রুপক্ষ যেন টের না পায় এই ছিল কুয়াশার ইচ্ছা।

সাড়ে চারটের দিকে কুয়াশার তৃতীয়বার গোটা ঘাঁটিটা চক্কর মেরে আবার পূর্বস্থলে ফিরে এসে দেখল কুঁড়েঘরগুলোর সামনের ট্রেঞ্চে কেউ নেই।

শত্রুপক্ষ কি নতুন কোন মতলব আঁটছে?

প্রশ্নটা মনে জাগতেই কুয়াশা ক্রল করে এগিয়ে যেতে শুরু করল।

এক মুহূর্ত পরই নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে এক লাফে উঠে দাঁড়াল সে। তারপর ছুটল কুঁড়েঘরগুলোর দিকে।

ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে প্রথম সারির ট্রেঞ্চের কাছে যেতে কুয়াশার লাগল দুটো মাত্র লাফ। তৃতীয় লাফ দেবার আগেই গর্জে উঠল শত্রুর মেশিনগান।

হুমড়ি খেয়ে পড়ল ট্রেঞ্চের ভিতর কুয়াশা। গুলি লেগেছে পায়ে।

পাশের ট্রেঞ্চে কামালের অর্ধেক দেহ।

ব্যাথায় চোখমুখ বিকৃত হয়ে উঠল কুয়াশার। এল. এম. জি.টা মাটির উপর সোজাভাবে রেখে কুঁড়েঘর দুটোর দিকে ব্রাশ ফায়ার করল ও।

পাল্টা জবাব এল না।

একমুহূর্ত পরই চমকে উঠল কুয়াশা।

চোদ্দ

আগুন।

শত্রুপক্ষ ঘাঁটি ত্যাগ করে ধুপপাড়ার পিছন দিক দিয়ে পালিয়েছে। আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেছে তারা বাড়িগুলোয়।

কুঁড়েঘর দুটোয় আগুন দেয়নি শত্রুরা।

আশঙ্কায় কেঁপে উঠল অন্তরাত্মা। মহুয়ারা কি বেঁচে নেই?

ঝুঁকে পড়ে বাঁ পায়ের ক্ষতস্থান পরীক্ষা করে কুয়াশা বুঝল হাঁটুর উপর এবং নিচে মোট তিনটে বুলেট লেগেছে। হাঁটুর উপরের বুলেটটা রয়ে গেছে ভিতরেই।

ট্রেঞ্চ থেকে উঠতে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হলো কুয়াশাকে।

প্রচণ্ড ব্যথায় সংজ্ঞা লোপ পাবে না তো?

প্রশ্নটা মনে জাগতেই কুয়াশা পা বাড়াল। ডান পা'টা এগোয়। কিন্তু বাঁ পা'টা এগোতে চায় না। প্রায় অবলম্বনহীন দশা বাঁ পা'টার।

অতিকষ্টে কয়েক পা এগোল কুয়াশা। দুর্বল হয়ে পড়ছে ও। অসহ্য ব্যথা। দাঁতে দাঁত চেপে কোন রকমে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে সে হয়ত। কিন্তু হাঁটবার শক্তি নেই।

রক্তে ভেসে যাচ্ছে মাটি।

কিন্তু এগোতে হবে। পিশাচ শত্রুরা হয়ত মহুয়াদেরকে বন্দিনী অবস্থায় রেখে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে ঘরে।

কুঁড়েঘরগুলোর খানিকটা পিছনে একচালাগুলো। দাউ দাউ করে জ্বলছে দুটো একচালা। পাশের কয়েকটা এখনও অক্ষত। কিন্তু আগুন ছুঁই ছুঁই করছে সেগুলোকেও।

পারছে না কুয়াশা। হাঁটা অসম্ভব। কেটে যাচ্ছে সময়। দশ মিনিট কি আরও বেশিক্ষণ আগে আগুন দিয়েছে শত্রু।

হঠাৎ বসে পড়ল কুয়াশা। তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। ডান পায়ের হাঁটু, দুই হাতের কনুই এবং বুকের উপর ভর দিয়ে এগিয়ে যেতে শুরু করল কুয়াশা।

কুঁড়েঘর দুটোর কাছে পৌঁছে কুয়াশা বিদ্যুৎবেগে পিছন ফিরে তাকাল হঠাৎ।

কি যেন দেখল কুয়াশা। দ্রুত কুঁড়েঘরের ভিতর টেনে নিয়ে গেল ও নিজের দেহটাকে।

একদল মানুষকে দেখা গেল।

এগিয়ে আসছে তারা কুঁড়েঘরগুলোর দিকে।

কুয়াশা বিমূঢ় হয়ে পড়ল। ব্যাপারটা পরিষ্কার হতে সময় লাগল আরও।

দশ-বারোজন পাঞ্জাবী সেনা এগিয়ে আসছে। তাদের কারও হাত দেখা যাচ্ছে না। প্রত্যেকের হাত পিছন দিকে।

পিছমোড়া করে বাঁধা নাকি?

পাঞ্জাবী শত্রুদের পিছনে একজনকে দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। চেনা যাচ্ছে না তাকে। লোকটার হাতে একটা টর্চ। অপর হাতে স্টেনগান।

কুয়াশা যে কুঁড়েঘরটার ভিতর লুকিয়েছে সেটার সামনে এসে দাঁড়াল খান-সেনারা।

হঠাৎ নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারল না কুয়াশা।

গলাটা রাসেলের।

কুয়াশার নাম ধরেই ডাকছে রাসেল।

'মি. কুয়াশা, ঘর থেকে বেরিয়ে আসুন তাড়াতাড়ি।'

রাসেলের কণ্ঠে তাড়া।

অনেক শক্তি ফিরে এসেছে কুয়াশার শরীরে। হামাগুড়ি দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এল সে। রাসেলের দিকে এগোতে এগোতে সবিস্ময়ে সে ভাবল—ছেলেটি কি যাদু জানে নাকি। রাতের অন্ধকারেও পরিষ্কার সব দেখতে পায়?

'গুলি লেগেছে বুঝি?'

জিজ্ঞেস করল রাসেল। উত্তর দিল না কুয়াশা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ও।

পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে একটি মেশিনগান। নলটা জঙ্গলের দিকে। ঝুঁকে পড়ল কুয়াশা। দুই হাতে ধরল মেশিনগানটাকে। ধরে ওঠাবার চেষ্টা করল।

প্রাণপণ শক্তিতে টেনে তোলার চেষ্টা করছে মেশিনগানটাকে কুয়াশা। ওটা নড়ছে, কিন্তু মাটি ছাড়ছে না।

একটা হেভি মেশিনগান একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে তোলা সম্ভব নয়। বড় বেশি ভারি।

'আমাকে দিন।'

ব্যর্থ হয়ে সরে দাঁড়াল কুয়াশা। রাসেল সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ওর বাঁ হাতে ওর নিজের স্টেনগানটা এখনও রয়েছে। সেটা ওর হাতেই রইল।

ডান হাত দিয়ে মেশিনগানটা ধরল রাসেল। দম বন্ধ করল। তারপর আকর্ষণ করল উপর দিকে।

অনায়াসে তুলে ফেলল হেভি মেশিনগানটাকে রাসেল এক হাতে।

বন্দী খান-সেনাদের দিকে মেশিনগানটা ফিট করে রাসেল কুয়াশাকে বলল, 'আপনি শুয়ে পড়ুন। পাহারা দিন। আমি দেখি মহুয়া ভাবীদের কি অবস্থা।'

কুয়াশা চমকে উঠল আগুনের দিকে তাকিয়ে।

'রাসেল। শোনো, রাসেল।'

রাসেল ততক্ষণ ছুটতে শুরু করেছে।

আগুন জ্বলছে সব কটা একচালাতেই। দুটো একচালার চাল ধসে পড়ল বলে।

রাসেল সেই দুটোর একটির সামনে গিয়ে এক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল। পিছন ফিরে কুয়াশার দিকে একবার তাকাল। তারপর মাথা নিচু করে এক লাফে জ্বলন্ত ঘরের জ্বলন্ত দরজা টপকে চোখের পলকে ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মনে মনে স্বীকার করল কুয়াশা এরকম অবিশ্বাস্য ঘটনা খুব কমই দেখা যায়। অপরকে বাঁচাবার জন্যে কেউ এমন ভাবে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় না।

দুই কাঁধে দু'টি লাশ নিয়ে আধ মিনিট পরই বেরিয়ে এল রাসেল।

লাশ দুটো কার দূর থেকে তা বোঝবার উপায় নেই।

আবার ঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকল রাসেল। ঠিক দশ সেকেণ্ড পরই একচালাটার চাল খসে পড়ল।

শিউরে উঠল কুয়াশা।

কিন্তু চালটা ধসে পড়ার প্রায় সাথে সাথে আরও একটি লাশ নিয়ে এক লাফে বাইরে বেরিয়ে এল রাসেল।

লাশ তিনটে রেখে কুয়াশার সামনে এসে দাঁড়াল রাসেল। হাঁপাচ্ছে ও।

'শহীদ ভাইয়ের খবর কিছু জানেন?'

'জানি।'

আঙুল বাড়িয়ে শহীদের দেহটা দেখিয়ে দিল কুয়াশা।

'মারা গেছেন?'

অসম্ভব ভারি এবং উৎকণ্ঠিত কণ্ঠস্বর কুয়াশার।

'জানি না।'

খান-সেনাদের দিকে চেয়ে উত্তর দিল কুয়াশা। ধীর, শান্ত কিন্তু বলিষ্ঠ পদক্ষেপে শহীদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রাসেল।

আগুনের লালচে আভায় শহীদের মুখের দিকে তাকিয়েই পাথরের মত স্থির হয়ে গেল রাসেল।

ঝাড়া এক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল রাসেল। দুই গাল বেয়ে নোনা জল নেমে আসছে ওর দুই চোখ থেকে। শহীদের মুখের অবস্থা মর্মান্তিক। চেনা দায়। চেষ্টা করে চিনতে হয়।

শহীদের পাশে বসল রাসেল। ধীরে ধীরে শহীদের একটি হাত তুলে নিল নিজের হাতে।

উত্তপ্ত হাত।

পালস্ দেখল দ্রুত রাসেল।

আশার আলো ফুটে উঠল বুকে।

শহীদ মরেনি। বেঁচে আছে এখনও। হয়ত বাঁচবে।

কুয়াশার সামনে এসে দাঁড়াল আবার রাসেল। বলল, 'মহুয়া ভাবীরা কেউ বেঁচে নেই।'

এদিক ওদিক তাকাল রাসেল। কুয়াশা নিষ্পলক তাকিয়ে আছে রাসেলের দিকে।

কি একটা দেখে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে জিনিসটা তুলে নিল রাসেল।

একটি রাইফেল। বেয়োনেট লাগানো।

কুয়াশার দিকে তাকাল আবার রাসেল ফিরে এসে। বলল ওদের সবাইকে বেয়োনেট চার্জ করে খুন করা হয়েছে।

পাখি ডাকছে। পুবাকাশ রাঙা হয়ে উঠছে। সেদিকে তাকিয়ে রাসেল যেন আপন মনেই বলে উঠল, 'লাল রক্ত দেখতে চাই আমি তাদের, যারা আমার মা-বোন-ভাবীকে খুন করেছে।'

আচমকা বিদ্যুৎবেগে লাফ মেরে খান-সেনাগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল রাসেল।

বন্দী সেনারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই রাসেল পাশাপাশি তিনজনের বুকে বেয়োনেট ঢুকিয়ে বের করে নিয়ে চতুর্থজনের দিকে পা বাড়াচ্ছিল, এমন সময় কুয়াশার ভারি কণ্ঠস্বর কানে ঢুকতে থমকে দাঁড়াল ও।

'এদিকে এসো, রাসেল।'

কুয়াশার গলায় কেমন যেন একটা আপনজনের সুর। এগিয়ে আসে রাসেল।

কুয়াশার পাশে দাঁড়ায় রাসেল।

কুয়াশা বলে, 'ওদেরকে হত্যা করার জন্যে এত কষ্ট স্বীকার করছ কেন, ভাই? ধরে ধরে ওই আগুনে ফেলে দিই এসো।'

প্রতিহিংসায় থরথর করে কাঁপছে রাসেল। কথা বলতে পারল না ও।

হঠাৎ দুই হাতে মুখ ঢেকে রাসেল কাঁপা গলায় বলে উঠল, 'মেরে ফেলুন ওদেরকে, মি. কুয়াশা। মেরে ফেলুন পশুগুলোকে। ওরা এখনও বেঁচে আছে এ আমি সহ্য করতে পারছি না।'

গর্জে উঠল কুয়াশার মেশিনগান।

শীতল বাতাস বইছে চারদিকে। দিনের আলো ফুটছে।

মাটি খুঁড়ছে রাসেল।

সূর্য উঠল। কবরের সামনে দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করে কি যেন বলল ওরা দুজনেই। কুয়াশা এবং রাসেল।

খানিকক্ষণ পর দেখা গেল রোদের উপর দিয়ে কুয়াশা হেঁটে যাচ্ছে। কুয়াশার পায়ে ব্যান্ডেজ। একটা হাত সে রেখেছে রাসেলের বাঁ কাঁধে।

শহীদের অচেতন, রক্তাক্ত দেহটা ডান কাঁধে নিয়েছে রাসেল।

কান পেতেও একটা গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে না আর।

ভলিউম-১২

কুয়াশা

৩৪, ৩৫, ৩৬

কাজী আনোয়ার হোসেন

কুয়াশা, শহীদ ও কামাল।
দেশে-বিদেশে অন্যায় অবিচারকে দমন করে
সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করাই এদের জীবনের ব্রত।
এদের সঙ্গে পাঠকও অজানার পথে
দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়ে পড়তে পারবেন,
উপভোগ করতে পারবেন
রহস্য, রোমাঞ্চ ও বিপদের স্বাদ।
শুধু ছোটরাই নয়, ছোট-বড় সবাই এ বই পড়ে
প্রচুর আনন্দ লাভ করবেন।
আজই সংগ্রহ করুন।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০